পরমা প্রকৃতি সারদা

মণি বাগচি

: পরিবেশক :

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক :
রবীন বল
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ
৮ মহালয়া, ১৩৬৩

মুদ্রাকর :
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

পরমা প্রকৃতি সারদা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিনী সারদামণি একাধারে সন্ন্যাসিনী ও ভারতীয় নারীসমাজের আদর্শ। নিবেদিতা বলতেন, ভারতীয় নারীকুলের আদর্শের শেষ কথা সারদাদেবী। তিনি যেমন এক প্রাচীন আদর্শের শেষ উদাহরণ আবার অন্যদিকে এক নতুন আদর্শের তিনিই প্রথম উদাহরণ। জ্ঞান ও মাধুর্য, সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন শ্রীমা সারদা। কোমলতা ও কৌতুক-প্রিয়তাও তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে শুধু স্বামী, এমন কি, সাধারণ দেবতা হিসেবে দেখতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ ছিলেন ভগবান।

জীবের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ, শক্তি-স্বরূপিনী সারদাদেবীও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন দু'জনেই অভিন্ন। রামকৃষ্ণের জীবনকথা তোমরা পাঠ করেছ, এইবার শ্রীমায়ের পুণ্য জীবনকাহিনী তোমাদের জীবনে এনে দিক এক নতুন প্রেরণা, নতুন আলো।

মণি বাগচি

বিশ্বজননী

করুণাপাথার জননী আমাব
এলে মা করুণা করিতে।
তাপিতের তরে নরদেহ ধরে
অশেষ যাতনা সহিতে ॥
ত্রিদিব ত্যজিয়া এ ধরায় আসা,
সন্তান তরে কত কাঁদাহাসা।
অহেতুক তব এই ভালবাসা,
পারি কি গো মোরা বুঝিতে ॥
শত জনমের যত পাপ হায়,
দিয়াছি ঢালিয়া ঐ রাঙা পায়,
সকলি তো তুমি সহিলে হেলায,
কোল দিতে কত তাপিতে।
ভকতি-বিহীন হৃদয় আমার,
কেমনে পূজিব শ্রীপদ তোমার
নয়ন ভরিয়া দাও প্রেমধার,
পদপঙ্কজ ধোয়াতে ॥

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

এই বই লিখতে শ্রীমায়ের জীবন কাহিনীর অনেক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে 'রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' বই দুটি থেকে।—লেখক।

এই লেখকের লেখা আরও কয়েকখানা জীবনী-সংগ্রহ

* শরৎচন্দ্র
* রামমোহন
* যুগাবতার রামকৃষ্ণ
* বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
* পরমা প্রকৃতি সারদা

এক

আরামবাগের কাছে তেলোভেলোর মাঠ।

মাঠ তো নয় যেন একটা ছোট খাটো সমুদ্র। সে মাঠের সীমা দেখা যায় না—এমন বিরাট মাঠ। সেই বিস্তীর্ণ মাঠ পার হয়ে তারকেশ্বর যেতে হয়। সকালে, দুপুরে অথবা সন্ধ্যাবেলায় সে মাঠ দিয়ে যেতে লোকের গা ছমছম করত। এই মাঠ ছিল তখন ডাকাতদের একটা ঘাঁটি। অনেক পথিককে এখানে প্রাণ দিতে হয়েছে। মাঠের মাঝখানে ছিল একটা কালীমন্দির। মন্দিরের ভেতরে করালবদনা এক কালীমূর্তি। ইনিই তেলোভেলোর ডাকাতে কালী। এঁকে পূজো করেই ডাকাতরা লুটপাট করতে অথবা মানুষ খুন করতে বেরুত। একা এই মাঠ কেউ পার হতে পারত না—দল বেঁধে যেতে হতো।

সেই মাঠ দিয়ে পায়ে হেঁটে জন কতক স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে চলেছেন একটি বৌ। তিনি থাকেন দক্ষিণেশ্বরে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গের সাথীরা এগিয়ে যায়, বৌটি পিছিয়ে পড়েন। শেষে এমন হলো যে, তিনি আর পথ চলতে পারেন না। সঙ্গের লোকেরা ততক্ষণে মাঠ পার হয়ে তারকেশ্বরের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছে। বৌটি

একা, শরীর অবসন্ন, আর পা চলে না তাঁর। মাঠের বুক জুড়ে নামে সন্ধ্যার জমাট অন্ধকার। কি করবেন ভাবছেন, এমন সময়ে দেখলেন প্রকাণ্ড চেহারা ঘোর কালো রঙের এক পুরুষ লাঠি কাঁধে নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। পালানো বা চেঁচানো বৃথা। বৌটি তখন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সেই লাঠিধারী লোকটার জন্য অপেক্ষা করেন। ভয়ে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে।

—কে গা এ-সময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ ?

—বাবা, আমার সঙ্গিরা আমাকে ফেলে গিয়েছে আমি পথ ও ভুলেছি।

—কোথা থেকে আসছ, যাবে কোথায় ?

—কামারপুকুর থেকে আসছি, যাব দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে তোমার জামাই রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন।

বৌটির কথা শেষ হবার আগেই সেখানে উপস্থিত হয় এক কৃষ্ণাঙ্গী নারী। ঐ লোকটির বৌ। তাকে দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বৌটি তখন তার হাত ধরে ও মা বলে ডেকে বলেন, মা আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় খুব বিপদে পড়েছি।

এরপর সেই ডাকাত আর তার বৌ দু'জনে বৌটিকে সঙ্গে করে তারকেশ্বরে তাঁর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসে।

এই বৌটি হলেন সারদামণি।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী পরমাপ্রকৃতি সারদাদেবী।

বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটি গ্রাম।

সেই গ্রামে বাস করতেন এক অতি নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ। নাম তাঁর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মুখুজ্যে-পত্নী শ্যামাসুন্দরী একদিন স্বপ্ন দেখলেন। অদ্ভুত স্বপ্ন। তিনি ঘাটে জল নিতে এসেছেন। দেখেন, একটি ছোট্ট মেয়ে মল পায়ে দিয়ে নাচতে নাচতে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখুজ্যে-পত্নী জ্ঞান হারিয়ে

মাটিতে পড়ে গেলেন। স্বপ্নের কথা স্বামীকে বলেন শ্যামাসুন্দরী; জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁ গা এমন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম কেন?

—তোমাকে তো বলিনি বৌ, ঐরকম একটা স্বপ্ন আমিও একদিন দেখেছি।

সত্যি? তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ বলো না?

—দেখলাম, একটি অপরূপা ছোট্ট সুন্দরী মেয়ে আমার কাছে এসেছে। আমার পিঠের ওপর উঠে হাসছে। মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লাগল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তুমি? কেনই বা এসেছ? মেয়েটি বললে, এই এমনি এলাম তোমার কাছে। তোমাদের ঘরে আমি থাকব।

—তাহলে আমাদের ঘরে বোধ হয় কোনো দেবীর আবির্ভাব হচ্ছে।

—আশ্চর্য কি! হয়তো তাই। এখন থেকে আমরা একটু নিষ্ঠার সঙ্গে থাকব, কি বলো?

এর অল্পকাল পরেই শ্যামাসুন্দরী গর্ভে একটি সন্তান ধারণ করেন। সেই সন্তান কন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘরে। সেদিন তারিখ ছিল ১৮৫৩ সাল, ২২শে ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার।

বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো
পৃথিবীর এই মাটিতে।
মহামায়া জন্ম নিল
জয়রামবাটিতে॥

শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে হয়েছে শুনে পাড়াপড়শিরা দেখতে এলেন। সবাই বললো, মুখুজ্যে মশাইয়ের ঘর আলো করে মেয়ে এসেছে—আর কি সুলক্ষণা। এক বর্ষিয়সী মহিলা বললেন, সন্দেশ খাওয়াতে হবে আমাদের সবাইকে, ফাঁকি দিলে শুনব না। এই আপনার প্রথম সন্তান।

—নিশ্চয়ই খাবেন। আপনারা আশীর্বাদ করুন মেয়ে যেন বেঁচেবর্তে থাকে।

রামচন্দ্রের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। যজমানি কিছু ছিল। কিন্তু তাতে তো আর সংসার চলে না। তাই ব্রাহ্মণকে তুলোর চাষ করতে হতো। বাড়ির সংলগ্ন জমিতেই তিনি এই চাষ করতেন। শ্যামাসুন্দরী ঘর-সংসারের কাজ করতেন, আবার চাষের কাজে স্বামীকে সহায়তা করতেন। ঘরে তৃতীয় কেউ ছিল না যে মেয়েটির দেখাশুনা করে। মেয়ে এখনো হামা দিতে পারে না। ঘরে একা রেখে আসতে পারতেন না, যদি কিছু অনর্থ ঘটে। তাই যখন তুলোর ক্ষেতে কাজ করতে আসতেন সঙ্গে নিয়ে আসতেন মেয়েটিকে। কাজ শুরু করার আগে শিশু কন্যাকে একটা নিরাপদ জায়গায় শুইয়ে রেখে কাজে যেতেন।

একদিন ক্ষেতের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তিনি স্বামীকে বলেন, জানো, আজ একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। আমি তো মেয়েকে শুইয়ে রেখে কাজ করছি আর মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি। আজ দেখি কিনা একটা বনের পাখি এসে ওর কাছে বসলো। পাখিটা অবাক হয়ে ওর চাউনি লক্ষ্য করতে লাগলো। তারপর চুপটি করে ওর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো। তোমার মেয়েও পাখিটার দিকে সমানে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। কিছুক্ষণ পরে পাখিটা নিজে থেকেই উড়ে গেল। মেয়েও অমনি খিল খিল করে হেসে উঠলো। ওর মুখের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো বনের ঐ পাখিটা যেন ওর কত কালের চেনা সাথী।

রামচন্দ্র শুনে বললেন, তোমার মেয়ে দিনের পর দিন যত বড় হবে, এমন অবাক কাণ্ড আরো কত ঘটবে দেখতে পাবে।

কথায় কথায় শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁগা, মেয়ের কি নাম হবে?

আমার কি মনে হয় জানো? আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম আর তুমি যে স্বপ্ন দেখেছিলে তাতে মনে হয় স্বয়ং মহামায়া মানবীর রূপ ধরে আমাদের ঘরে এসেছে। আমি তাই একটা নাম ঠিক করেছি।

—কি নাম ?

—সারদা।

—ও আমাদের চোখের মণি। তাই মেয়েকে আমি ডাকব সারদামণি বলে।

যখন জয়রামবাটির মতো এক অখ্যাত পল্লীতে এক ব্রাহ্মণদম্পতি তাঁদের স্নেহের দুলালীর এই নামটি রেখেছিলেন, তখন কি তাঁরা স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে, ইনিই একদিন এক বিশ্ববরেণ্য সাধকের জীবনসঙ্গিনী-রূপে সারা পৃথিবীতে, বাংলার ঘরে ঘরে শ্রীমা বলে সম্পূজিতা হবেন ?

দেখতে দেখতে মেয়ে চার বছরের হলো। সেই বয়সেই ঘর সংসারের টুকিটাকি কাজে সে তার মাকে সাহায্য করে। চাল থেকে ধান বাছা, গরুর জন্য ঘাস কেটে আনা এমন নানা কাজে সে তার মাকে সাহায্য করে। একদিন মেয়ের জ্বর হয়েছে দেখে মা তাকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বললেন। কিন্তু মায়ের কথায় কান দেয় না সারদা। বাড়িতে মুংলী গরু তার বড় আদরের। ঘাস না আনলে সে না খেয়ে থাকবে। রোজ এই কাজটা সে-ই করতো। তাই মায়ের অসাক্ষাতেই জ্বর গায়ে পুকুর থেকে দলঘাস কেটে নিয়ে এলো।

মা তিরস্কার করলেন বটে, কিন্তু ঐটুকু মেয়ের জীবজন্তুর প্রতি মায়ামমতা দেখে তিনি ভাবলেন, সময় হলে সারদা একদিন বড় হবে। এই সময়ে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখা গেল। সারদা যখন পুকুরে নাইতে যেত তখন তাঁকে সাহায্য করতো কালো রঙের একটা মেয়ে। সারদা কৌতূহলী হয়ে তার পরিচয় জানতে চেয়েছে, কিন্তু মেয়েটি প্রথম প্রথম সেটা গোপন করবার চেষ্টা করেছে। পরে একদিন বলেছে। আমি তোমার সই। থাকি পাশের গাঁয়ে।

মেয়েটি কাজের সময় কথা বলত না। কাজ শেষ হয়ে গেলে সইয়ের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে চলে যেত। শ্যামাসুন্দরী বা রামচন্দ্র বুঝতে পারেন না, অমন একটি মেয়ে রোজ কেন এসে সারদাকে দলঘাস কাটার জন্য সাহায্য করে। উনি কি ছদ্মবেশিনী মহামায়া ?

ছেলেবেলায় খেলাধুলা করতে ভালবাসত না সারদা। ছোটমেয়ে খেলা না করে, এমন ভাবে সংসারের কাজ নিয়ে থাকে কেন। বাড়ির লোকেরা বা পাড়ার বয়সী মেয়েরা অবাক হন সারদার মধ্যে এই রকম ভাব দেখে। শ্যামাসুন্দরী বলতেন, আমার মেয়ে ঐ রকম।

সময়ে সময়ে শীষ থেকে পাকা ধান ঝরে গিয়ে মাটির ওপর পড়ে যায়। সারদা তার ছোট্ট হাত দিয়ে তাই কুড়িয়ে নেয়। এতটুকু অপচয় সে সহ্য করতে পারে না। মাটির ছোট ছোট ঢেলা সরিয়ে ধানগুলো খুঁটে খুঁটে তোলে সারদা। তারপর সেগুলো যত্ন করে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। মাকে দিয়ে দেয়। ঐটুকু মেয়ের মধ্যে এমন গুণের পরিচয় পেয়ে স্নেহময়ী মা সারদাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করেন।

কখনো দেখা যায় যে লক্ষ্মী ও কালীর ছোট মূর্তি নিয়ে নিজের মনে ফুল বেলপাতা দিয়ে তাদের সাজিয়ে ভক্তিভরে অর্চনা করে সারদা। কে তাকে এসব শেখালো? বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবেন রামচন্দ্র। এমনি ভাবে ছেলেবেলায় সারদা নানা রকম দেবদেবীর অর্চনা করতো। পাড়ার মেয়েরা অবাক হতেন তার মধ্যে এই রকম ভাব দেখে। বালিকা মেয়ের পূজা অর্চনায় একাগ্রতা লক্ষ্য করে শ্যামাসুন্দরীও অবাক হতেন।

একবার গ্রামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হলে। দলে দলে লোক আসে সারদাদের ছোট্ট বাড়িতে। সবাই জানতো রাম, মুখুজ্যে খুব দয়ালু ব্রাহ্মণ। ক্ষুধার্তরা বাড়িতে এলে তাদের যত্ন করে খাওয়াতো সারদা। উঠোনের এককোণে শ্যামসুন্দরী খিচুড়ি রান্না করেছেন। সেই খিচুড়ি ক্ষুধার্তদের পাতায় তুলে দিতে সারদার মনে যে কী তৃপ্তি। তার সেই করুণামাখা মুখটিতে যেন জগন্মাতার মুখ ভেসে উঠতো। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে রামচন্দ্রের অন্তর থেকে উঠতো এই স্তব 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।'

দুই

দেখতে দেখতে সারদা ছ বছরেরটি হলেন।

একদিন একজন পড়শি শ্যামাসুন্দরীকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেন, মুখুজ্যে-বৌ মেয়ের তো বিয়ের বয়স হলো। বর খুঁজবে না?

—এই তো সবে পাঁচ পেরিয়ে ছয়ে পড়ল, এর মধ্যেই বিয়ে?

—এই বয়সেই তো মেয়েদের বিয়ে ভাল। আমারই তো ছ' বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল।

—তবু আর কিছুদিন যাক, তখন বর খুঁজব। কর্তা অবিশ্যি বলেই রেখেছেন মেয়েকে তিনি গৌরী দান করবেন।

কিন্তু মেয়ের এমনই ভাগ্য যে পাত্র খুঁজতে হলো না। পাত্র নিজেই এসে উপস্থিত হলেন রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে। পাত্রের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে। ক্ষুদিরাম তখন মারা গেছেন; সংসার দেখাশুনা করেন তাঁর বড় ছেলে রামেশ্বর। গদাধর তখন দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে পূজারীর কাজ করেন। বয়স তেইশ হলো। সংসারের ওপর তাঁর যেন এতটুকু আকর্ষণ নেই। গদাধরের মা চন্দ্রাদেবী একদিন বড়ছেলেকে বললেন, গদাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো; একটা

ভালো দেখে মেয়ে দেখো। ওকে সংসারী করতে না পারলে আমার মনে শান্তি নেই।

রামেশ্বর পাত্রীর খোঁজে লোক পাঠালেন নানা জায়গায়। তিনি নিজেও ঘুরলেন কয়েক জায়গায়। কিন্তু মনের মতো পাত্রী মেলে না কোথাও। যদি বা মেলে পণের অঙ্কটা বেশি হয়। এমন সময় গদাধর এলেন কামারপুকুরে মা-কে দেখতে। বাড়ি এসে শুনলেন তাঁর বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু মনের মতো পাত্রী কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না; দাদা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছেন। তখন একদিন গদাধর মা-কে বললেন, তোমরা মিছিমিছি খোঁজাখুঁজি করছ। আমার তো কুটো বাঁধা আছে।

—কুটো বাঁধা আছে? সে কিরে?

—হ্যাঁ মা। জয়রামবাটিতে রাম মুখুজ্যের বাড়িতে তোমরা লোক পাঠাও। তাঁরই একমাত্র মেয়ে সারদা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করা আছে।

শুনে মা তো হেসে মরেন। বল্লেন, পাগল ছেলে কি বলে দ্যাখো। ভাইয়ের কথামত রামেশ্বর জয়রামবাটিতে রাম মুখুজ্যের বাড়ি লোক পাঠালেন। কামারপুকুর থেকে চার মাইল দূরে জয়রামবাটি গ্রাম। লোক ফিরে এসে খবর দিল যে, গদাধর যা বলেছেন তা ঠিক। তারপর রামকুমার নিজে গেলেন মেয়ে দেখতে। মেয়ে দেখে তাঁর পছন্দ হলো। কথাবার্তা পাকা হলো, এমন কি বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেল। গদাধরের বয়স তখন তেইশ পূর্ণ হয়ে চব্বিশ চলছে।

১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মেয়ের সঙ্গে গদাধরের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে মেয়ের বাবা তিনশো টাকা পণ পেলেন। কিন্তু বিয়ের সময় মেয়েকে তিনি গয়না দিতে পারলেন না; শুধু শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে শুভকাজ কোনমতে সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণের অভাবের সংসার, গয়না দেবেন কোথা থেকে। নববধূকে বরণ করলেন চন্দ্রাদেবী মনের আনন্দে। কিন্তু বধু

নিরালংকারা। চন্দ্রাদেবী বিষণ্ণ হন। ভাবেন, ছেলের বৌ দেখতে এসে লোকে কি বলবে? নতুন কুটুম্বদের সামনে বৌকে একটু সাজিয়ে বের করতে না পারলে তাঁর মানসম্ভ্রম রক্ষা হয় কি করে? লাহা বাবুরা চন্দ্রাদেবীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি রামেশ্বরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমার মা অত ভাবছেন কেন? নতুন বৌকে সবার সামনে সাজিয়ে বের করবার জন্য এখান থেকে কিছু গয়না নিয়ে যাও। রামেশ্বর গয়না নিয়ে এলেন। তাই দিয়ে গদাধরের বৌকে সাজিয়ে দেওয়া হলো।

বৌকে সাতদিন বাদে বাপের বাড়ি পাঠাবার নিয়ম। লাহা-বাবুদের বাড়ি থেকে গয়না চেয়ে পাঠানো হলো। চন্দ্রাদেবীর দুশ্চিন্তা হলো—কোন্ প্রাণে তিনি বালিকার অঙ্গ থেকে গয়নাগুলো খুলে নেবেন? তাঁর মনের কথা টের পেলেন গদাধর। তিনি মাকে শান্ত করে বলেন, কিছু ভেবোনা মা। রাতে নববধূ যখন ঘুমিয়ে, তখন গদাধর তার গা থেকে এমন কৌশলে গয়নাগুলি খুলে নিলেন যে, বালিকা তার কিছুই জানতে পারল না। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু ঘুম ভাঙলে শ্বাশুড়ীকে বলেছিল. আমার গায়ে যে এত গয়না ছিল, তা কোথায় গেল?

—মা। গদাধর তোমাকে এরচেয়েও ভাল গয়না কত দেবে।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই মিটল না। মেয়ের কাকা ঐদিন তাকে দেখতে এসে ঐ কথা জেনেছিলেন ও রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়ে ঐদিনেই সারদাকে বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। নতুন কুটুমের এই অভদ্র আচরণে চন্দ্রাদেবী মনে মনে খুব দুঃখ পেয়েছেন দেখে গদাধর তাঁর ঐ দুঃখ দূর করবার জন্য পরিহাস করে বলেছিলেন, মা, এখন ওরা যাই বলুক ও করুক না। বিয়ে তো আর ফিরবে না।

বিয়ের পর দেখতে দেখতে এক বছর সাতমাস কেটে গেল। সেই যে বিয়ের আগে এসেছিলেন গদাধর আর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান

নি। চন্দ্রাদেবীও ছেলেকে যেতে দেন নি, পাছে ফিরে গিয়ে বায়ুরোগটা আবার বাড়ে। কিন্তু এবার ফিরবার জন্য ব্যস্ত হলেন। মাকে বললেন। চন্দ্রাদেবী তখন বললেন, বিয়ের পর তো একদিনও শ্বশুরবাড়ি গেলি না। একবার জয়রামবাটি যা, সেখানে দু'চার দিন থেকে, বৌকে সঙ্গে নিয়ে যোড়ে চলে আসবি।

শ্বশুরবাড়ি এলেন গদাধর। স্বামীকে দেখে বালিকা বধূ খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি স্বামীর ধূলি-মলিন পা দুটি নিজের হাতে ধুয়ে দিলেন। তারপর নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন পা'দুটি। পরে তালপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। কিন্তু জামাইয়ের হাবভাব দেখে শ্বশুরবাড়ির অনেকে তাঁকে পাগল বলে ভাবতে লাগল। কানাঘুঁষো কথা চলে, গদাধরের ভ্রূক্ষেপ নেই; সতী-সাধ্বী সারদাও পতিনিন্দা শুনে বিচলিত হন না।

কিছুদিন পরে গদাধর সারদাকে নিয়ে এলেন কামারপুকুরে। মামীকে দেখা মাত্র ভাগ্নে হৃদয় কতকগুলো পদ্মফুল নিয়ে এলো। মামীকে পূজো করবে। কত নিষেধ করলেন সারদা; হৃদয় শুনলেন না মামীর কোনো ওজর আপত্তি। জোর করে মামীর পাদুটি অর্চনা করলে মনের সাধ পুরিয়ে। হৃদয় ছিল মামাঅন্ত প্রাণ; দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের তত্ত্বাবধান তো সে-ই করতো। সংসারে উদাসীন তার মামা যে এতদিন বাদে বিয়ে করেছেন, এতে সবচেয়ে খুশি হয়েছিল হৃদয়। যে কয়দিন তিনি কামারপুকুরে অবস্থান করেছিলেন সেই কয়দিন বালিকা বধূকে সংসারধর্ম পালন করা সম্পর্কে গদাধর অনেক কিছু শিক্ষা দিলেন। অনেক দিন হয়ে গেল, এইবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরবার জন্য তিনি অস্থির হলেন। মা অনুরোধ করলেন আরো কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাবার জন্য। কিন্তু সংসারের অভাব অনটনের কথা তাঁর জানা ছিল। তাই মা কিম্বা দাদার কথা না শুনে তিনি কালীবাড়িতে ফিরে, আগের মতো জগদম্বার সেবা কাজে ব্রতী হলেন।

সারদামণির বয়স এখন তেরো বছর।

স্বামী তখন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজায় রত। তিনি যে বিয়ে করেছেন, তাঁর যে সংসার আছে, সে-সব কথা এখন তাঁর মন থেকে একরকম মুছে গিয়েছে বললেই হয়। চন্দ্রাদেবীও তখন দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন। সারদা এসেছেন শ্বশুড়বাড়িতে। গদাধরের ভাইঝি লক্ষ্মী হলো তাঁর সঙ্গী, যদিও, সে বয়সে সাত বছরের ছোট ছিল। দু'জনে একসঙ্গে বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে বর্ণপরিচয় পড়েন। একদিন হৃদয় এসে বলে, মামী, একি করছ? মেয়েছেলের লেখাপড়া শিখতে নেই, জানো না। কিন্তু সারদা শোনেন না ভাগ্নের নিষেধ। এইভাবেই হয়েছিল তাঁর অক্ষর পরিচয়। তবে সারদার স্মৃতিশক্তিটা ছিল খুব প্রখর। পাড়াগাঁয়ে নানা জায়গায় হতো কথকতা, যাত্রাগান। বাড়ির বষিয়সী মহিলাদের সঙ্গে তিনি যেসব শুনতে যেতেন আর যখন যা শুনতেন তাই অবিকল মনে রাখতেন।

শ্বশুরবাড়িতে তাঁর সবচেয়ে অসুবিধা ছিল স্নানের ব্যাপারটা নিয়ে। নতুন জায়গা, তাঁর বয়স অল্প। সঙ্গে করে নদীতে নিয়ে যাবার লোকও নেই বাড়িতে। তাই রোজ স্নান করতে যাবার সময় সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবতেন। একদিন দেখতে পেলেন আটজন মেয়ে নদীর ঘাটে চলেছে তাঁর শ্বশুর বাড়ির সামনে দিয়ে। তারা সারদাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, চান করতে যাবে?

—হ্যাঁ যাবো।

—তুমি কি রোজই চান করতে যাও?

—যেতে ইচ্ছা করে, সঙ্গীর অভাবে পারি না।

—তাহলে আমাদের সঙ্গে রোজ যেও।

সেই থেকে সারদা মনের আনন্দে সেই আটটি মেয়ের সঙ্গে স্নান করতে যেতেন। স্নান শেষ করে তিনি যখন ঘরে ফিরতেন তখন ঐ আটটি মেয়ে তাঁকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যেত। যতদিন কামারপুকুরে ছিলেন ততদিন তাঁকে স্নানের জন্য আর কোনো অসুবিধা

ভোগ করতে হয়নি। এই আটটি মেয়ে, শ্রীমা বলতেন, মহামায়ার অষ্টসখী।

কিছুদিন কামারপুকুরে কাটিয়ে সারদা আবার এলেন বাপের বাড়িতে। প্রতিবেশিনীরা তাঁকে দেখে নানা রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে সারদা, তোর কি রকম অদৃষ্ট রে?

—কেন মাসী, আমার অদৃষ্ট মন্দ হবে কেন?

—বলি তোর বরটা তো পাগল শুনতে পাই।

—মিছে কথা। ওসব দুষ্টু লোকের রটনা।

গদাধর যে ঠিক প্রকৃতিস্থ নন, একথাটা জয়রামবাটিতেও তখন জানাজান হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে থাকতে তাঁর বায়ুরোগ হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কামারপুকুরে আনা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্বামী যে সত্যি পাগল নন, সেটা তিনি অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন। তাই লোকের কথায় বড় একটা কান দিতেন না।

দক্ষিণেশ্বর থেকে খবর এলো গদাধর আবার পাগল হয়েছেন। লোকের মুখে এই কথা শুনে চন্দ্রাদেবী খুব অস্থির হলেন। বড়ছেলে রাজকুমার তখন মারা গেছেন; শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা তখন অপর দুটি ছেলের---রামেশ্বর ও গদাধর—মুখচেয়ে কোনরকমে বুক বেঁধে ছিলেন। ছোট ছেলের বিয়ে দিলেন এই আশায় যে, হয়ত অসুখ সেরে যেতে পারে। এইবার তিনি কামারপুকুর থেকে গদাধরের কাছে চলে এলেন ও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন।

চন্দ্রাদেবী দক্ষিণেশ্বরে থাকতেই রামকৃষ্ণের আবার অসুখ করে। এবার কঠিন পেটের অসুখ। ঠিক হলো তিনি দেশে ফিরে যাবেন কিছুদিনের জন্য। মথুরানাথের স্ত্রী জগদম্বা নিজে সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে 'বাবা'কে কামারপুকুরে পাঠিয়ে দিলেন; সঙ্গে এলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও ভাগ্নে হৃদয়। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই গদাধরকে দেখবার জন্য অস্থির হয়েছিলেন। সকলেই তাঁকে দেখে আশ্চর্য হলো

—না, তাঁর মধ্যে কোথাও তো পাগলামির লেশমাত্র নেই। সকলের সঙ্গেই স্বাভাবিক ব্যবহার করেছেন, স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছেন। অনেক দিন পরে তাঁকে পেয়ে এই দরিদ্রের সংসারে এখন আনন্দের হাটবাজার বসল। একজন বয়স্কা প্রতিবেশিনী বললেন, লোক পাঠিয়ে এখন বৌমাকে এখানে আনালেই ভালো হয়। গদাইকে দেখাশুনা করার জন্যও তো একজন দরকার। গদাধর অবশ্য 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বললেন না।

জয়রামবাটিতে খবর গেল—গদাধর কামারপুকুরে এসেছেন অসুস্থ শরীরে; তাঁর সেবার একান্ত প্রয়োজন। স্বামীর অসুখের খবর শুনে সতী-সাধ্বী স্ত্রী সারদা তখনি রওনা হলেন কামারপুকুরের উদ্দেশ্যে। তেরো বছর বয়সের সময় একবার এসে একমাস এখানে একা থেকে গিয়েছিলেন। সারদা এলেন—বিয়ের পর প্রকৃতপক্ষে এই তাঁর প্রথম স্বামীকে দেখা। এবার গদাধর কামারপুকুরে ছ'সাত মাস ছিলেন। স্ত্রীকে দেখে খুশি হলেন তিনি।

—দ্যাখো পেটের অসুখে ভুগে ভুগে শরীরটা খুব কাহিল হয়েছে।

—চিন্তা করো না। আমি তোমার সেবা করব; তুমি ভালো হয়ে উঠবে। তোমার রান্না আমি নিজের হাতেই করব।

—অতটুকু মেয়ে তুমি, রাঁধবে কি গো? লক্ষ্মীর মা রান্না করবে।

—না, না। তুমি যা খাবে, আমাকে বলো। আমি রাঁধতে শিখেছি।

তখন স্ত্রীকে রান্নার কথা খুঁটিনাটিভাবে জানিয়ে দিলেন তিনি। একদিন হয়েছে কি ঘরে পাঁচফোড়ন নেই। লক্ষ্মীর মা বললে, অমনি রান্না করো। শুনে গদাধর বলেন, না থাকে এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তাতে তা বাদ দিলে চলবে কেন? স্বামীর মুখে এই কথা শুনে অবাক হন সারদা। কে বলে ইনি পাগল, কে বলে ইনি সংসার বিরাগী? তাই যদি হবে, এমন কথা তবে তিনি কেমন করে বলেন।

এবার কামারপুকুরে গদাধর অনেকদিন ছিলেন—প্রায় সাত মাস। এই সময়টা তিনি বৃথা যেতে দেননি। সারদা যখন স্বামীর সেবা করতে এখানে এলেন তখন গদাধর স্ত্রীকে মনের মতো করে শিক্ষা দিতে থাকেন—সংসারধর্ম কেমন করে পালন করতে হয়, কেমন করে পাঁচ-জনকে নিয়ে থাকতে হয়, এইরকম যাবতীয় খুঁটিনাটি তাঁকে শিখিয়েছিলেন। উত্তরকালে তাই শ্রীমা বলতেন, এমনকি প্রদীপের সলতেটা পর্যন্ত কি রকম করে তৈরী করে সন্ধ্যার আগে ঠিক করতে হয় তাও হাতে করে শিখিয়েছেন। সংসারে সব বিষয়েই তাঁর এমন প্রখর জ্ঞান ছিল যা দেখে আমি সময় সময় অবাক হতাম। এমন স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

দক্ষিণেশ্বর থেকে খবর এলো মথুরবাবু তীর্থে যাবেন ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে। কামারপুকুর থেকে চলে এলেন গদাধর। তারপর বৃদ্ধা মা ও ভাগ্নে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন তিনি। সারদামণি ফিরে যান তাঁর বাপের বাড়িতে।

———

তিন

—বাবা, আমি দক্ষিণেশ্বরে যাব।

—বেশ তো জামাইকে লিখে দিই। সে নিয়ে যাবে, অথবা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

— তাঁকে লিখে লাভ নেই, বাবা।

—কেন? তবে তাঁর ভাগ্নে হৃদয় রামকে চিঠি লিখি।

—কাউকেই চিঠি লিখতে হবে না। শুনছি তোমার জামাইয়ের শরীর আবার আগের মতো হয়েছে। সামনের দোলপূর্ণিমায় এখান থেকে অনেকে গঙ্গাস্নান করতে কলকাতা যাচ্ছে। আমি তাদের সঙ্গে যাব।

—তা হয় না মা। আমিই তোকে রেখে আসব।

—না বাবা। তুমি বুড়ো হয়েছ, এতটা পথ পায়ে হাঁটতে পারবে কেন।

—ওরে বেটি রাম মুখুজ্যে এখনো বিশক্রোশ পথ অনায়াসে হেঁটে পার হতে পারে। তুই সব গোছগাছ কর, যেদিন যাবি তার আগের দিন আমাকে বলিস।

কামারপুকুর থেকে চলে আসার পর আরো চারটি বছর কেটে

গেল একে একে। সারদা দেবীর বয়স এখন আঠার বছর। আবার দক্ষিণেশ্বর থেকে খবর আসে স্বামী পাগল হয়ে গেছেন—পরণে কাপড় নেই কেবল হরি হরি করে বেড়ান। তবে কী লোকের কথাই ঠিক। যা রটে তা কিছুটা বটে। যদি আগের মতোই হয়ে থাকে, তবে তো তাঁর জয়রামবাটিতে আর থাকা উচিত নয়, তাঁর পাশে থেকে তাঁরই সেবা করা কর্তব্য। এইসব কথা মনের মধ্যে গভীর ভাবে চিন্তা করে সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে যাওয়াই ঠিক করলেন এবং সেখানে গিয়ে চোখকানের বিবাদভঞ্জন করবেন ও পরে যা কর্তব্য বলে বিবেচনা করবেন সেইমত করবেন।

সামনেই দোলপূর্ণিমা। তাঁর কয়েকজন আত্মীয়া গঙ্গাস্নান করতে কলকাতায় যাবেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি যাবেন ঠিক করলেন এবং তাঁর বাবাকে যখন তাঁর মনের সংকল্প জানালেন তখন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজেই মেয়েকে রেখে আসবেন বললেন। মেয়ের এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। বুদ্ধিমান পিতা শুনেই বুঝলেন। মেয়ে কেন এখন কলকাতায় যেতে চাইছেন। তিনি তখন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আসবার জন্য সব বিষয়ের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

এক শুভদিন দেখে তাঁরা যাত্রা করলেন। স্নানার্থীর দলটি বেশ ভারি। ধানের খেতের পর ধানের খেত, পদ্মফুলভরা কত পুকুর দেখতে দেখতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি গাছের শীতল ছায়ায় শরীর জুড়োতে জুড়োতে তাঁরা সবাই প্রথম দু'দিন পর্যন্ত বেশ মনের আনন্দেই পথ চলতে লাগলেন। কিন্তু ঐ আনন্দ আর শেষ পর্যন্ত রইলো না। এত হাঁটা সারদাদেবীর কখনো অভ্যাস ছিল না। পথেই তিনি প্রবল জ্বরে পড়লেন। মুখুজ্যের চিন্তা হলো। মেয়ের এই অবস্থায় পথচলা অসম্ভব বুঝে তিনি একটা সরাইখানায় আশ্রয় নিয়ে থাকতে লাগলেন।

তখনকার সেই অবস্থা শ্রীমা নিজে তাঁর স্ত্রীভক্তদের কাছে এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

'জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, লজ্জাসরম শূন্য হয়ে পড়ে আছি, তখন দেখলাম পাশে একজন মেয়ে এসে বসল। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনো দেখিনি। আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে যেতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথা থেকে আসচ গা? মেয়েটি বলল আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। শুনে অবাক হয়ে বললাম, দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়াতে আমার ভাগ্যে ঐসব আর হলো না। মেয়েটি বলল, সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বৈকি, ভালো হয়ে সেখানে যাবে। তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি। আমি বললাম, বটে? তুমি আমাদের কে হও গা? মেয়েটি বললে, আমি তোমার বোন হই। আমি বললাম, বটে? তাই তুমি এসেছ! এর পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।'

সকালবেলায় উঠে রামচন্দ্র দেখলেন, মেয়ের জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। মেয়েকে নিয়ে তিনি আবার পথ চলতে শুরু করলেন। কিছুদূর যেতে না যেতে একখানা পালকিও পাওয়া গেল। সারদার আবার জ্বর এলো, তবে প্রকোপটা ঠিক আগের মতো নয়। এই জ্বরের কথা বাবাকে তিনি জানালেন না। ক্রমে পথের শেষ হলো। তখন রাত নটা যখন তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে পৌছলেন। সোজা গদাধরের কাছেই এসে দাঁড়ালেন সারদা। এমন জ্বর গায়ে স্ত্রীকে আসতে দেখে তিনি খুব চিন্তিত হলেন। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর বাড়বে বলে তাঁর নিজের ঘরে আলাদা বিছানায় সারদামণির শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

—তুমি এতদিনে এলে? আর কি আমার সেজবাবু আছে যে তোমার যত্ন হবে।

কি দরদভরা কথা! এমন কথা কি পাগলে বলে, মনে মনে ভাবেন সারদামণি, আর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভালবাসায় ভরে ওঠে

তাঁর অন্তর। ওষুধ পথ্যাদির ব্যবস্থা হলো। তিন-চারদিনেই শ্রীমা সুস্থ হয়ে উঠলেন। ঐ তিন-চারদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দিনরাত নিজের ঘরে রেখে ওষুধ-পথ্যাদি সকল বিষয়ের নিজে দেখাশুনা করলেন, পরে একটু সুস্থ হলে নহবত ঘরে তাঁর নিজের মায়ের কাছে সারদাদেবীর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

চোখ কানের বিবাদ মিটল। পরের কথায় মনের মধ্যে যে সন্দেহ জেগেছিল তা একেবারে দূর হয়ে গেল। সারদামণি মনে প্রাণে বুঝলেন, তাঁর স্বামী আগে যেমন ছিলেন, এখনো তেমন আছেন। যা কিছু শুনেছেন, সে সবই রটনা মাত্র। দেবতা দেবতাই আছেন। মনের আনন্দে তিনি নহবতে থেকে দেবতার ও দেবতার মায়ের সেবায় নিযুক্ত হলেন। মেয়ের আনন্দে পিতা আনন্দিত হয়ে কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে থেকে নিজ গ্রামে ফিরলেন পুলকিত চিত্তে। ফিরে গিয়ে স্ত্রী শ্যামাসুন্দরীকে বললেন জামাইয়ের কথা। বললেন, জামাইকে কে পাগল বলে? যে তাঁকে পাগল বলে সে নিজেই পাগল।

—আচ্ছা মেয়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করলে?

—সে আর তোমাকে কি বলব, বড়বৌ। মেয়ের তো রাস্তায় জ্বর হয়েছিল। জ্বর নিয়েই সেখানে এলো। তারপর জামাই তার কি সেবাটাই না করলে। ওষুধ খাওয়ান, পথ্যের ব্যবস্থা করা—এমনটা আমি কখনো দেখিনি বা শুনিনি।

শুনে মায়ের মন মেয়ের সৌভাগ্যে আনন্দ বোধ করলো।

নহবতে শ্বাশুড়ী-বৌ একসঙ্গে থাকেন।

শ্বাশুড়ীর সেবা ও স্বামীর সেবা একসঙ্গে করেন সারদা। মাঝে মাঝে গদাধর নহবতে এসে স্ত্রীর সঙ্গে কতরকম গল্পগুজব করতেন। একদিন কথায় কথায় গদাধর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁগা, তোমার কি মনে হয় আমি তোমাকে ত্যাগ করেছি। সরলা সারদা দ্বিধাহীন

কণ্ঠে উত্তর দিলেন, না, তুমি আমাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছ। তোমার সেবা করে আমি কৃতার্থ হচ্ছি।

কিছুদিন বাদে একদিন স্ত্রীকে ডেকে গদাধর বলেন, আজ থেকে তুমি আর নহবতে রাতে থাকবে না। আমার ঘরে এসে শোবে।

শুনে খুশি হলেন সারদা। কে না চায় স্বামীর পবিত্র সঙ্গ। আবার ভয়ও জাগে মনে। ভাবেন শ্বাশুড়ী বৃদ্ধা, তাঁকে একা নহবতে ফেলে যাওয়া কি ভাল হবে! একটা রফা হলো মনের সঙ্গে—রাতে পতিসেবা আর দিনে পতির জননীর সেবা করবেন। গদাধরের কথামত সারদা স্বামীর ঘরে শুতে লাগলেন। পাশাপাশি দুটি তক্তপোষ। একটিতে শোন গদাধর, অপরটিতে সারদা। সারা রাত ধরে গদাধর নিজের তক্তপোষের ওপরে বসে ধ্যান করেন; স্ত্রী তখন অঘোরে ঘুমিয়ে থাকেন। কিন্তু এক একবার স্বামীর ঐরকম হাবভাব দেখে ভয় পান তিনি। একদিন তো হৃদয়কে ডেকে আনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গদাধরের ধ্যান ভেঙে গেল। স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বললেন, আহা, অমন করো না—ভয় পাবার কিছু নেই। আমি সমাধিস্থ হলে বা আমার এমন ভাব দেখলে কানে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করো। তাহলে আমার ভাল হবে—ফিরে পাব স্বাভাবিক অবস্থা। সেই থেকে স্বামীর কথামত এবং হৃদয়ের সাহায্য নিয়ে সারদা মাঝে মাঝে গদাধরের ধ্যান ভাঙতেন।

দিন যায়। স্বামীকে নিয়ে ঘর করছেন। পাঁচজনে কত কথা বলে। বলে সারদা বুঝি বোকা মেয়ে—সংসার ধর্ম কিছু জানে না। এতকাল বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আজো একটি পুত্র সন্তানের মুখ দেখতে পেলেন না তিনি। একদিন স্বামীর পদসেবা করতে করতে তিনি মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এইভাবে, তাইতো আমাদের ছেলেপুলে একটাও হলো না, সংসার ধর্ম বজায় থাকবে কিসে? স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে হাসলেন গদাধর। তাঁর মুখ থেকে এমন কথা শুনবেন, এ যেন তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। তাই হেসে বললেন, তুমি একটি

ছেলে চাইছ কি গো। তোমার এত ছেলে হবে যে তাদের মা ডাকের চোটে তুমি অস্থির হবে।

লেখাপড়া তিনি সামান্যই জানতেন; কিন্তু তার বেশি জানতেন অনেক শাস্ত্রকথা, অনেক প্রাচীন কাহিনী যা তিনি যাত্রাগানের মারফত শুনেছিলেন ছেলেবেলায় আর সেগুলি থেকে লাভ করেছেন অমূল্য শিক্ষা। তাই স্বামীর মুখ থেকে আজ এরকম কথা শুনবার পর সারদা আর কিছু বললেন না, বা আর কোন দিন তিনি এই প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে বিব্রত করেন নি। তবু মনের মধ্যে তাঁর একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। স্বামী তাহলে তাঁকে কি দৃষ্টিতে দেখেন? এইসব চিন্তা করতে করতে একরাত্রে সারদা স্বামীর পা টিপতে টিপতে জিজ্ঞাসা করলেন, একটা কথা শুধাব, ঠিক উত্তর দেবে?

—বেঠিক উত্তর কখনো পেয়েছ আমার কাছ থেকে?

—আমি তোমার কে?

—তুমি? তুমি আমার আনন্দময়ী। যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন তিনিই নহবতে বাস করছেন। আবার তিনিই এখন আমার পা টিপছেন।

সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায় মন থেকে এই কথা শুনে।

নীরবে স্বামীর পদসেবা করতে থাকেন সারদা।

কিন্তু গদাধর বিষয়টা আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। পূর্ণযৌবনা স্ত্রীর দেহবুদ্ধি যাতে চিরকালের মতো তাঁর মন থেকে চলে যায় সেজন্য গদাধর একটা আশ্চর্য অনুষ্ঠান করলেন—ষোড়শী পূজা। স্ত্রীকে জগজ্জননী জ্ঞানে অর্চনা করবেন তাহলেই তাঁর মধ্যে শুদ্ধ মাতৃভাব জেগে উঠবে। তিনি শুভদিন দেখতে লাগলেন। সামনেই ফলহারিণী অমাবস্যায় কালিকাপূজা। ঐদিন গদাধর অর্চনা করলেন সারদাকে। জগদম্বাকে পূজা করবার জন্য আজ তিনি বিশেষ আয়োজন করেছেন। ঐ আয়োজন মন্দিরে না হয়ে তাঁর ইচ্ছানুসারে শান্তভাবে তাঁর ঘরেই হলো। রাত নটায় গদাধর পূজায় বসলেন। আলপনা

আঁকা পিঁড়িতে তিনি সারদাকে বসতে বললেন। সামনের কলসিতে মন্ত্রপূত জল ; সেই জল তাঁর সর্বাঙ্গে বারবার ছিটিয়ে দিয়ে তাঁকে অভিষিক্তা করলেন। তারপর গদাধর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁকে ষোড়শোপচারে পূজা করলেন।

স্ত্রীকে গরদের কাপড় পরিয়ে, ফুল-বেলপাতা আর মন্ত্র উচ্চারণ করে অনেকক্ষণ ধরে অর্চনা করলেন গদাধর। অর্চনা হয়ে গেলে তাঁর নিজের সাধন-জীবনের সমস্ত সম্বল অঞ্জলি দিলেন সারদার চরণে। নির্বাক হয়ে স্বামীর পূজা গ্রহণ করেন স্ত্রী—এমন পূজা কেউ কখনো দেখেনি বা শোনেনি। জেগে ওঠে তাঁর মধ্যে দেবীর ভাব। অঞ্জলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে পূজক মহাসমাধি লাভ করলেন। যখন সমাধি ভাঙল তখন গদাধর স্ত্রীকে বললেন, এবার তুমি নহবত ঘরে যেতে পার।

নিজের মনের মতো করে স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়ার বিরাম ছিল না গদাধরের। সময় পেলেই তিনি শ্রীমা-কে মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে সকল রকম শিক্ষা দিতেন। এইসময়ে একদিন সারদাদেবী যখন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন আচ্ছা সকলেরই কি ঈশ্বরকে ডাকবার অধিকার আছে? এর উত্তরে গদাধর তাঁকে বলেছিলেন চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে।

—ডাকলেই কি তিনি দর্শন দেন?

—হ্যাঁ যে তাঁকে অন্তর দিয়ে ডাকবে ঈশ্বর তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

—আমি যদি ডাকি, তিনি দেখা দেবেন।

—নিশ্চয়ই। তুমি ডাক তো তুমিও তাঁর দেখা পাবে। আমি তো ডেকে ডেকেই মায়ের দেখা পেয়েছি।

এ ছাড়া, সংসারের অনেক খুঁটিনাটি কাজ তিনি স্ত্রীকে যত্নের

সঙ্গে শিক্ষা দিতেন। কিভাবে তূলো থেকে সলতে তৈরি করতে হয়, সেই সলতে কেমন করে প্রদীপের মধ্যে রেখে জ্বালাতে হয় এসব তিনি নিজের হাতে করে শিখিয়েছিলেন। সারদা নিজেও অনেক রকম হাতের কাজ জানতেন। একদিন গদাধর তাঁকে বললেন, আমাকে একটা দড়ির শিকে বানিয়ে দিতে পার। ভক্তদের খেতে দেবার লুচি সন্দেশ ঐ শিকেয় রেখে দেব। স্বামীর কথামত সারদা শিকে তৈরি করতে লেগে গেলেন। কিছু পাট জোগাড় করে আনলেন। সেই পাট থেকে দড়ি তৈরি করে, তাই দিয়ে বানিয়ে দিলেন একটি সুন্দর শিকে। শিকেটি হাতে পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সে কী আনন্দ।

এবার দক্ষিণেশ্বরে অনেক রকম শিক্ষা দিলেন স্ত্রীকে গদাধর। সংসারে থাকতে হলে লোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, মেয়েদের চাল-চলন কি রকম হওয়া উচিত এইসব বিষয়। সাংসারিক বিষয়ের সঙ্গে উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়ও মাঝে মাঝে শিক্ষা দিতেন। অন্তর্যামী তিনি জানতেন যে, তিনি যখন এই সংসারে থাকবেন না, তখন যাঁকে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে থাকতে হবে, তাঁর সকল বিষয়েই যেন জ্ঞান থাকে, ধারণা থাকে।

সারদা খুব শান্ত প্রকৃতির ছিলেন।

নহবতে নীরবে দিন কাটাতেন। অনেকে টেরই পেত না, তিনি ওখানে রয়েছেন। তাই অনেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গেছে। এমন কি গদাধর পর্যন্ত অবাক হতো, ঐটুকু ঘরে একলা কেমন করে থাকেন সারদা। মাঝে মাঝে বলতেন, দিনরাত খাঁচার মধ্যে থাকলে পাখীরও বাত হয়। তুমি মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে। স্বামীর কথামত তিনি মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যেতেন।

নহবত ঘরে থাকতে বড় কষ্ট হয় সারদার এটা বিশেষ ভাবেই তিনি জানতেন। তাই ভক্ত শম্ভু মল্লিককে একদিন এই কথা বললেন শম্ভু মল্লিক তখনি নহবতখানার কাছে একখানি চালাঘর তৈরি করিয়ে

দিলেন। শ্রীমা এসে উঠলেন সেই চালাঘরে। কিছুদিন বাদে স্ত্রীর শরীর খারাপ হয়েছে দেখে গদাধর তাঁকে বললেন তুমি জয়রামবাটি চলে যাও। সেখানে কিছু দিন থাকলে মায়ের আদর যত্নে শরীরটা ভাল হতে পারে। জায়গা বদলানোর তো একটা গুণ আছে।

স্বামীর কথা রাখলেন সারদা। একটা শুভদিন দেখে তিনি বাপের বাড়ি চলে এলেন। কিন্তু এখানেও তাঁর শরীর ভাল হলো না। গ্রামের জাগ্রতা দেবী সিংহবাহিনীর কাছে হত্যে দিলেন একদিন। সিংহবাহিনী তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে বলেন, ওলতলার মাটি খা। ওখানকার মাটি খেলে তুই ভাল হয়ে যাবি। দেবীর নির্দেশমত মাটি খেয়ে ভাল হলেন সারদা। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে তিনি আবার জ্বরে পড়লেন। ম্যালেরিয়া জ্বর। পেট জোড়া পিলে। কুলের ডাল পুড়িয়ে পেটে ঘষে দেওয়া হলো। পিলে ভাল হয়ে গেল আর ম্যালেরিয়া জ্বরও সেরে গেল।

এমন সময় দক্ষিণেশ্বর থেকে খবর এলো গদাধরের কষ্ট হচ্ছে। খবরটা একজন লোক মারফৎ তিনিই সারদাকে পাঠিয়েছিলেন। হৃদয় কাছে নেই। সে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে চলে গেছে। রামলালের হাতে মায়ের ভার পড়েছে। সে ঠাকুরের দিকে ঠিকমত নজর রাখে না। এইসব কারণে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই বলে পাঠালেন, সারদা যেন অবশ্য আসেন। ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, তিনি দেবেন।

সারদা এলেন দক্ষিণেশ্বরে। কিছুদিন থেকে ঠাকুরের সেবা করে আবার ফিরে যান জয়রামবাটিতে। সেই থেকে তিনি প্রায়ই পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। অনেকখানি পথ আর তেমনি বিপজ্জনক। তাই একা আসতে ভয় পান। সঙ্গে কেউ থাকলে আর ভয় পান না। একবার তো সঙ্গীদের সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে আসবার সময় তেলোভেলোর মাঠে ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন।

কিছুদিন পরে গদাধরের কথামত তিনি দক্ষিণেশ্বরেই পাকাপাকি ভাবে অবস্থান করতে থাকতে। তখন চন্দ্রাদেবী মারা গেছেন। সেই নহবত ঘরেই এখন সারদার থাকবার জায়গা হলো। একদিন শুভ মুহূর্তে রামকৃষ্ণ সারদার জিবে মন্ত্র লিখে দিলেন। সেই থেকে তিনি প্রতিদিন স্বামীর দিকে মুখ করে বসে জপ ও ধ্যান করতেন। দিনে চারবার জপ করতেন।

গদাধরের অসুখ করলো। কবিরাজ এসে তাঁকে পরীক্ষা করে বিধান দিলেন, জলখাওয়া চলবে না। জলখেলে অসুখ সারবে না।

—তাহলে কি খাবো ?

কেন দুধ।

কবিরাজ চলে গেলে সরল প্রাণ গদাধর সারদাকে জিজ্ঞাসা করেন, কবরেজ বলে গেল, জল খাওয়া চলবে না, দুধ খেতে হবে। তা কি করে সম্ভব ?

—মায়ের ইচ্ছে হলে সবই সম্ভব হয়।

উত্তরটা ঠাকুরের খুব ভাল লাগল। তিনি আর কিছু বললেন না। তখন থেকে কিছুকাল যাবৎ দুধ খাওয়ার ফলে তাঁর অসুখ ভাল হয়ে গেল। এখন তিনি ভাত খাওয়া শুরু করেছেন। সারদা নিজে যত্ন করে রেঁধে নিজের হাতে ঠাকুরকে ভাত খাওয়াতে লাগলেন। রামকৃষ্ণ ছিলেন পেটরোগা রুগী। তাই তাঁর পথ্য শ্রীমা নিজে রাধতেন। সিদ্ধ ভাত আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে মণ্ড তৈরি করতেন। তারপর দলা করে খাইয়ে দিতেন স্বামীকে। ভাত খাওয়ার ফলে তাঁর চেহারা ফিরে গেল। একদিন সরলস্বভাব গদাধর নহবত ঘরে গিয়ে সারদাকে নিজের চেহারা দেখিয়ে বলেন, এই দেখো আমার চেহারা কেমন সুন্দর হয়েছে। তোমার যত্নেই এমনটি হলো।

ঠাকুরের কথা শুনে মৃদু হেসে সারদা নীরব থাকতেন। কখনো কখনো বলতেন সবই মায়ের ইচ্ছা।

চন্দ্রাদেবী মারা যাওয়ার পর নহবত ঘরে রামকৃষ্ণের আসা-যাওয়া

কমে গিয়েছিল। আগে যেতে আসতেন, এখন তাও আসেন না। একদিন স্ত্রীকে বললেন, আমি আর ওখানে যেতে যাব না তুমি বরং খাবারটা আমার ঘরে দিয়ে যেও। আমি এখানেই খাব। সারদা রাজী হলেন। খুশিও হলেন এই ভেবে যে খাবার দিতে এসে স্বামীকে দেখবার একটু সময় পাওয়া যাবে। কেননা, এমনিতে তো তাঁকে দেখতে পান না। দিনরাত তিনি ভক্তদের নিয়ে কাটান।

সেই থেকে শ্রীমা রোজ ঠাকুরের জন্য খাবার দিয়ে আসতেন তাঁর ঘরে। এই সময়টা তিনি স্বামীকে দেখতে পেতেন এবং দু'চার কথা বলতেন তাঁর সঙ্গে খাওয়ানো শেষ হলে পান সাজতে বসতেন। দু'রকম পান সাজতেন। এলাচ-মসলা দিয়ে একরকম আর একরকম শুধু চুন-খয়ের-সুপুরি দিয়ে। তাই দেখে ভক্ত যোগেন-মা জিজ্ঞাসা করেন, দু'রকম পান সাজেন কেন? উত্তর হলো ভালগুলো ওঁর ভক্তদের জন্য। ওদের আদর-যত্ন করে আমার কাছে টেনে নিতে হবে তাই। আর খারাপগুলো ওঁর। উনি তো আমারই আছেন, চিরকাল তাই থাকবেন।

কী সুন্দর, সরল মনের কথা। এমনটি নইলে কি আর তিনি যুগাবতারের লীলাসঙ্গিনী হয়ে এসেছিলেন।

গোলাপ-মা নামে ঠাকুরের একজন মেয়ে ভক্ত ছিল। রামকৃষ্ণ তাকে মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। একটি মাত্র ছেলে ছিল গোলাপ-মার। ছেলেটি হঠাৎ মারা যায়। পুত্রশোক ভুলবার জন্য ও মনে শান্তি পাবার আশায় সে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছিল। গোলাপ-মা রোজ নহবত থেকে ঠাকুরের জন্য খাবার নিয়ে আসত বলে আজকাল সারদার ভাগ্যে ঠাকুর-দর্শন জুটত না।

আর গল্প বা কথাও বলতে পারেন না স্বামীর সঙ্গে। তবু গোলাপ-মার ওপর রাগ নেই সারদার।

একঘেয়ে ভাবে দিন কাটে সারদার। সকালে ওঠেন। পূজো-জপ শেষ করে রান্নার কাজে যান। ঠাকুরের জন্য আহার তৈরি

করেন। নিজের হাতে দিতে পারেন না ঠাকুরকে। গোলাপ-মা নিয়ে এসে দিত। বেলা বারোটা কোনদিন বা একটা বেজে যায় সারদার খেতে। তারপর রোদে একটু গড়িয়ে নেন। চুলটা তখন শুকিয়ে যায়। কিন্তু বেশির ভাগ দিন চুলটা ভিজে থাকে। বিকালে আসে যোগেন-মা। সে-ই চুল বেঁধে দেয়। চুল বাঁধার পর ঘর ঝাঁট দেন, লণ্ঠন পরিষ্কার করেন সারদা। আবার রাতের জন্য রান্নার যোগাড় করেন। রাতে রান্না হয়ে গেলে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেন। তারপর নিজে কোন রকমে দু'মুঠো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন অতি সাধারণ একটা বিছানায়। এমনি করে চলতে থাকে নহবতে শ্রীমার দিনগুলি।

———

চার

একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে কষ্ট হয় সারদার।

একটা মনের মতো সঙ্গীর জন্য তাঁর মনটা অস্থির হতো। একদিন একটি মেয়েকে নিয়ে নহবতে এলেন ঠাকুর সারদার কাছে। বললেন, ব্রহ্মময়ী, ওগো ব্রহ্মময়ী! একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে। এই নাও একজন সঙ্গিনী এসেছে। এর নাম গৌরদাসী! আজীবন ব্রহ্মচারিণী। বাংলায় ইনি গৌরী-মা নামে দুর্লভ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ঠাকুরের আদেশে ইনি মেয়েদের উন্নতির কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সারদাদেবী যতদিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন গৌরদাসী তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী হয়ে থাকতেন।

শ্রীমা'র শরীর খারাপ হলে ঠাকুর বিচলিত হতেন। সারারাত তিনি ঘুমোতে পারতেন-না যদি শুনতেন সারদার মাথা ধরেছে। রামলালকে ডেকে আদেশ করেন, ওরে, তোর খুড়িমার বড় মাথা ধরেছে। মাথা যাতে ছাড়ে তার ব্যবস্থা কর। সারদা যখন এইকথা জানতে পারতেন তখন তাঁর সমস্ত অন্তর শ্রদ্ধায় ভালবাসায় স্বামীর দুই পায়ে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়তো।

একদিন কথায় কথায় রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ক'টাকা

হাত খরচ লাগে মাসে? সরল মনে সারদা জবাব দিলেন, পাঁচ-ছ' টাকা। ঠাকুর যখন মায়ের পূজারী ছিলেন তখন তিনি মাসে একশো টাকা করে মাইনে পেতেন। সেটাকা তিনি নিজে নিতেন না। হৃদয়ের কাছে জমা থাকত। খরচও করতেন না। এইভাবে তাঁর তহবিলে কিছু টাকা জমেছিল। একদিন ভাগ্নেকে বললেন, হৃদু, তোর মামীর জন্য দু'গাছা সোনার ডায়মণ্ড-কাটা বালা গড়িয়ে দে। হৃদয় এই কথা শুনে খুব খুশি হয়। সে নিজেই কতদিন ভেবেছে যে মামীর হাত দুটো খালি, দু'গাছা বালা হলে ঐ হাতের না জানি কত শোভা হবে। খবরটা মামীকে দিতে হবে। সে চলে এলো নহবতখানায়। সারদা তখন রান্নার জোগাড় করছিলেন।

—মামী, একটা ভাল খবর আছে। কি খাওয়াবে বলো?

—কি খবর হৃদু?

—মামা তোমার জন্য ডায়মণ্ড কাটা বালা গড়িয়ে দিতে বলেছে।

—বালা কি হবে রে?

—পরবে তুমি। দেখি মাপটা দাও। আজই স্যাকরার কাছে গিয়ে অর্ডার দিয়ে আসতে হবে।

—আচ্ছা হৃদু একটা কথা শুধোই। এত টাকা তোমার মামা পাবেন কোথায়?

—কেন আমার মামাকে তুমি কি ফকির মনে করো? ওঁর জমানো টাকা সব আমার কাছে আছে। মামা তো কোন কালেই টাকা পয়সা ছোয় না, যা মাইনে পেতেন তার সবই আমার কাছে থাকত।

সপ্তাহ খানেক বাদে বালা গড়িয়ে এলো। সারদা মনের আনন্দে সে বালা পরলেন। তাই দেখে ঠাকুরের মনে আনন্দ আর ধরে না। তার কারণও আছে। সেই সে বিয়ের কনের গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছিলেন, তখন চন্দ্রা দেবী পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, গদাই তোমাকে অনেক ভাল গয়না গড়িয়ে দেবে। স্বামীর দেওয়া এই বালা শ্রীমা'র হাতে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। ঠাকুর যখন

দেহ রাখেন তখন সারদা হাতের বালা দুটি খুলতে যাবেন এমন সময় অশরীরী রামকৃষ্ণ তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়ে নিষেধ করেন। সেই সময়ে স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন—তুমি জগজ্জননী—ঐশ্বর্যময়ী। তুমি চিরসধবা। এই বালা তোমার চিরকালের ভূষণ।

পাণিহাটির মহোৎসব খুব প্রসিদ্ধ। নিত্যানন্দ প্রভু এই উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। সেই থেকে প্রতি বছর গঙ্গার তীরে পাণিহাটি গ্রামে ঐ উৎসব হয়ে আসছে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকবার এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। ইদানীং আর যেতেন না। ১৮৮৫ সালে গরমের দিনে অনেক বরফ তিনি খেয়েছিলেন বলে তাঁর গলায় খুব বেদনা হয়েছিল। অনেক চিকিৎসাতেও তা সারে না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে তিনি পাণিহাটির উৎসবে যাবেন ঠিক করলেন। ভক্তদের ইচ্ছা নয় যে গলার বেদনা নিয়ে ঠাকুর উৎসবে যোগদান করেন।

ঠাকুর পাণিহাটির উৎসবে যাবেন শুনে একজন স্ত্রীভক্তকে দিয়ে সারদা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, তিনি যাবেন কিনা। ঠাকুর বললেন, তোমরা তো যাচ্ছ, যদি ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হলো না। বললেন, মেলায় বড় ভিড় হবে। আমি বাপু অত ভিড়ে যেতে পারব না। তিনি যাননি বলে ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন, ও খুব বুদ্ধিমতী।

রামকৃষ্ণের সন্তানদের মধ্যে বাবুরাম নামে একজন ছিলেন। তিনি দিনের বেলায় ভবতারিণীর প্রসাদ খেতেন, রাতে শ্রীমা'র কাছে রুটি খেতেন। একদিন বাবুরামকে কাছে ডেকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, তুই ক'খানা রুটি খাচ্ছিস।

—পাঁচ-ছ'খানা খাই।

—কেন অতো খাস।

—মা দেন তাই না যেয়ে পারি না।

ঠাকুর অমনি চলে এলেন নহবত ঘরে। শ্রীমা তখন সেদিনের রান্নার আয়োজন করছিলেন। হঠাৎ সেখানে স্বামীর আগমনে তিনি বিস্মিত হন।

—তুমি কি বেশি বেশি খাইয়ে ছেলেগুলোর আখের মাটি করবে?

—ত্ব'খানা রুটি বেশি খায় তাতে কি হবে শুনি? বাবুরাম আমার ছেলে। ও যদি ত্ব'খানা রুটি বেশি যায় তাতে কোন ক্ষতি হবে না। তুমি ওকে কিছু বলো না। ওর ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি ওর ভার নেব।

এই কথা শোনার পর ঠাকুর আর কিছু বললেন না। স্ত্রীর মধ্যে মায়ের এই রূপটাই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সোজা ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করেই তার দৃষ্টি পড়ল ময়লা বিছানার ওপর। সে ঠাকুরের একজন ভক্ত। অনেক টাকার মালিক—তার সম্পত্তি অঢেল। ঠাকুরের ময়লা বিছানা কেমন করে বদলে দেওয়া যায়, এই নিয়ে সে চিন্তা করতে লাগল। চিন্তার ফাঁকে এক সময় ঠাকুরকে বললে, আমি আপনার নামে দশ হাজার টাকা লিখে দিচ্ছি। তার স্থদ থেকে আপনার চলে যাবে।

—ও আমি নিতে পারব না।

তবে হৃদয়বাবুর কাছে দিয়ে যাই। আপনার সেবায় লাগবে।

—না বাপু! তুমি টাকা নিয়ে যাও। ও আমার দরকার নেই। হৃত্বর কাছে থাকলেও আমাকে তদারক করতে হবে। এ ঝামেলা আমার পোষাবে না।

হৃদয় কিন্তু টাকাটা হাতছাড়া করতে চায় না। তাই সে তখন লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারিকে নিয়ে এলো শ্রীমা'র কাছে। মামীকে সব কথা সে খুলে বললো। তিনিও স্বামীর মতো ফিরিয়ে দেন হৃদয়কে।

বলেন, যে টাকা তোমার মামা নিতে পারেন নি, সে টাকা আমি কেমন করে নিই।

শুনে ঠাকুর খুব খুশি হলেন। বললেন, আমি জানি কিছুতেই ও টাকা নেবে না। ও বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে।

বাগবাজারের বলরাম বসু ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতেন। বলরাম গৃহিণী রামকৃষ্ণকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। তার কাছে ঠাকুর ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবান। একবার বলরামের স্ত্রীর খুব অসুখ করল। ভক্তের কষ্ট দেখে ঠাকুরের যে কি কষ্ট। সারদাকে আদেশ করলেন, বলরামের বৌয়ের বড় শক্ত অসুখ। তুমি একবার তাকে দেখে এসো।

রামকৃষ্ণ তো বলে খালাস। কিন্তু কিসে করে যাবেন শ্রীমা বলরামের বাড়ি? গরুর গাড়ি বা পালকি নেই। তিনি তাই ইতস্তত করেন। ঠাকুর আবার বলেন, যাও না, একবার তোমার ছেলের বৌকে দেখে এসো না! সে যে মরতে বসেছে।

স্বামী যখন বারবার আদেশ করছেন তখন সারদা তাঁর কথা মাথায় করে নিলেন। গাড়ি নাই বা থাকল, পা তো আছে। পায়ে হেঁটে চললেন বলরামের বাড়ির দিকে। এমন সময়ে পথে দেখা হলো পালকিওলাদের সঙ্গে। ওরা তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন মা? জায়গার নাম বললেন সারদা। তারা ওঁকে তুলে নিল পালকির ভেতর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি পৌঁছলেন বলরাম বসুর বাড়িতে। পালকিওয়ালারা তাঁকে নামিয়ে দিয়েই চলে যায়—ভাড়া চাইল না।

পানিহাটির উৎসবে যোগদান করে ঠাকুরের গলায় বেদনা বাড়ল। ক্রমে আবার মাস অতীত হলো। মাসখানেক চিকিৎসাতে গলার বেদনা কমে না। কোন কিছু কঠিন খাদ্য ও তরিতরকারী গলা দিয়ে

নামত না। দুধভাত ও সুজির পায়স মাত্র খেয়ে ঠাকুরের দিন কাটে। একদিন গলা দিয়ে খানিকটা রক্ত পড়ল। তখন নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিষ্যরা খুব চিন্তিত হলেন। ডাক্তার এসে বললেন, এ ক্যান্সার অসুখ। রোগীকে এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত। এ রোগের কোন ওষুধ এখনো বের হয়নি।

১৮৮৫ সালের ভাদ্র মাসে ঠাকুরকে ভক্তরা কলকাতায় নিয়ে এলেন। শ্যামপুকুর স্ট্রীটে তাঁর জন্য একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া করা হয়। ওপরের বারান্দার পশ্চিমে ছোট একখানি ঘরে শ্রীমা'র থাকার ব্যবস্থা হয়; বড় বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুরের থাকার ব্যবস্থা হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য আনা হলো। রোগীর সেবার জন্য অবশ্য ভক্ত ও শিষ্যরা ছিলেন কিন্তু তাঁর পথ্য তৈরি করার কাজটা শ্রীমা ভিন্ন আর কে করবেন। একমহল বাড়িতে, অপরিচিত পুরুষদের মধ্যে, সকল রকম শারীরিক অসুবিধা সহ্য করে সারদামণি যেভাবে তিন মাস নিজের কর্তব্য পালন করেছিলেন তা দেখে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন। নরেন, রাখাল, শশী ও কালী প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানগণ তখন মায়ের যাতে কোন রকম অসুবিধা না নয়, সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন।

দক্ষিণেশ্বরে লোকের দৃষ্টির আড়ালে নিঃশব্দে সারদামণির দিন কাটত নহবতখানার ছোট্ট ঘরটিতে; শ্যামপুকুরের বাড়ির তেতলার চাতালে তিনি ঠিক তেমনি স্বচ্ছন্দে থাকতেন—অথচ কেউ বুঝতে পারতেন না যে, শ্রীমা এখানে রয়েছেন। অল্প জায়গা, তবু তারই মধ্যে থেকে, ডাক্তারের নির্দেশমত তিনি ঠাকুরের জন্য দু'বেলা পথ্য তৈরি করতেন। নিজের হাতে খাওয়াতেন ঠাকুরকে। আর সেই সঙ্গে সাধ্বীর অন্তর থেকে সর্বদা এই প্রার্থনা উঠত, মা জগদম্বা, ওঁর রোগ সারিয়ে দাও। ওঁকে সুস্থ রাখো। শ্যামপুকুরের বাড়ির পরিবেশ বিশেষ ভাল ছিল না। রোগীর পক্ষে তা মোটেই প্রীতিপ্রদ ছিল না। হোমিওপ্যাথি থেকে আরম্ভ করে সকল রকম চিকিৎসা হলো। তবু

অসুখ ভালর দিকে গেল না। বরং দিনের পর দিন খারাপ হতে থাকে। তাই দেখে চিন্তিত হন সকলে। চিন্তিত হন সারদা।

এবার ভক্তেরা ঠিক করলে, অন্য জায়গায় একটি বাসা ঠিক করে সেখানে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হবে। কাশীপুরে গঙ্গার ধারে একটা বাগান বাড়ি ঠিক করা হলো। খুব বড় না হলেও কাশীপুরের বাগান বাড়িটা বেশ সুন্দর। নীচের প্রকাণ্ড হল ঘরে সেবক ও ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা হলো, উপরের একটি প্রশস্ত ঘরে থাকতেন ঠাকুর; ঘরের দক্ষিণে পাঁচিল-দেওয়া ছোট্ট ছাদ—ঠাকুর কখনো কখনো সেই ছাদে পায়চারি করতেন। এই বাড়িতে ঠাকুর আট মাস কাল ছিলেন। তাঁর পথ্য তৈরি করবার ভার আগের মতো শ্রীমা'র হাতেই রইল রামকৃষ্ণের ভাইঝি লক্ষ্মী এই সময়ে কাশীপুরের বাড়িতে থেকে শ্রীমা'কে সাহায্য করতেন।

অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর সুজিরমণ্ড খেতেন। সারদা তৈরি করে দিতেন। কখনো বা তিনি মাংসের বা গুগলির ঝোল রেঁধে দিতেন। ছেলেরা বাগানের পুকুর থেকে ঠাকুরের জন্য ঐ গুগলি তুলে আনতেন। নিজের হাতে যত্ন করে তিনি পথ্য তৈরি করে খাওয়াতেন। স্বামীর রোগভোগের কষ্ট তিনি চোখে দেখতে পারতেন না; ভবতারিণীর কাছে দিনরাত জানাতেন আকুল প্রার্থনা স্বামীর আরোগ্যের জন্য।

দিন যায়।

ঠাকুরের গলার ঘা আর ভাল হয় না।

ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। শ্রীমা রোজ সলতে দিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করতেন সেই ঘা। তাতে ঠাকুরের বিশেষ কষ্ট হতো না। একদিন স্ত্রীকে বললেন, জানি। মায়ের কাছে আমার আরোগ্যের জন্য তুমি দিনরাত প্রার্থনা করছ। কিন্তু আমি যে ভক্তদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। যদি সারদা কখনো প্রশ্ন করতেন তোমার তো শুদ্ধ পবিত্র দেহ, এমন কাল রোগে ধরল কেন?—তখন ঠাকুর

উত্তর দিতেন, অনেক লোকের পাপ নিয়েই তো আমার এই দশা। মায়ের ইচ্ছেতেই এসব করতে হয়েছে।

আর একদিন ঠাকুর বললেন শ্রীমা'কে জানো, আমার এই দেহের মধ্যে মা ভবতারিণী নিজে ভক্ত নিয়ে লীলা করছেন। সারদামণি মুগ্ধ হয়ে শোনেন স্বামীর এই কথা, আর মনে মনে বলেন—জানি তুমি ভূভার হরণ করতে এসেছে। যখন যেমন ভাবে কাজ করার দরকার হয় তেমনি ভাবে কাজ কর। তোমার মহিমা বোঝা ভার। যুগের প্রয়োজন মেটাতে তোমাকে বারবার আসতে হয় এ পৃথিবীতে, আর নরদেহ ধারণ করে মানুষের মধ্যে মাততে হয় বিচিত্র লীলায়। তোমার মহিমা আমার মতো ক্ষুদ্র নারী কি ভাবে বুঝবে!

ঠাকুরের অসুখ দিন দিন বেড়েই চললো। কমের দিকে তা আর গেল না। মহাচিন্তায় পড়লেন সারদা স্বামীর জন্য। চিকিৎসার চূড়ান্ত হলো। ডাক্তাররা মুখে না বললেও মনে মনে জবাব দিয়ে গেছেন। তবু সারদার চেষ্টার অন্ত নেই—সেবার বিরাম নেই। ঠিক করলেন তারকেশ্বরে গিয়ে সেখানকার জাগ্রত দেবতা বাবা তারকনাথের মন্দিরে-হত্যে দেবেন স্বামীর আরোগ্যের জন্য। গেলেন তারকেশ্বরে। দু'দিন হত্যে দেওয়ার পর চলে এলেন নিরাশ হয়ে। বুঝতে পারলেন, ঠাকুরের পার্থিব লীলার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

—কি গো, কি হলো? হত্যে দিয়ে এলে।

—এলাম। কিছু হলো না। হত্যে দেওয়া সফল হলো না।

—আমি জানি কিছু হবার নয়।

তবু সারদা আশা ছাড়লেন না। এলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে। এই তো সেই রামকৃষ্ণ-পূজিতা দেবী। ঠাকুর যে মায়ের কত আদরের, একথা জানতেন সারদা। তাই তো ছুটে এলেন এখানে। কিন্তু দেখলেন, জগজ্জননীও ঘাড় কাৎ করে আছেন, তাঁর গলাতেও রয়েছে ক্ষত। সব বুঝলেন তিনি।

১৮৮৬ সালের ৩১ শে শ্রাবণ, রবিবার রাত একটা।

কিছুতেই কিছু হলো না। ঠাকুর দেহ রাখলেন। চলে গেলেন পৃথিবী ত্যাগ করে মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ। শিশুর মতো আকুল স্বরে কেঁদে ওঠেন সারদা—আমার মা কালী কোথায় গেলে তুমি। হাতের বালা দু'গাছি খুলতে যাবেন এমন সময় ঠাকুর অশরীরী মূর্তি নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, ও কি করছ? আমি কি কোথাও গেছি? এ-ঘর থেকে ও-ঘর। শ্রীমা বুঝলেন তাঁর পতি-দেবতা বেঁচে আছেন। তিনি নিত্য। বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। তিনি আর শোক করলেন না। পাঁচ দিন পরে লক্ষ্মীকে নিয়ে শ্রীমা চলে এলেন বলরামের বাড়িতে।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁর সন্তানদের চিন্তা হলো মা'কে নিয়ে। রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি শ্রীমা—এই বিশ্বাস ছিল তাদের। যখন গৃহী ভক্তরা বললো, ঠাকুর যখন নেই তখন কাশীপুরের সংসার রেখে কি হবে। কিন্তু নরেন, রাখাল প্রভৃতি সন্ন্যাসী সন্তানরা বললেন, কিছু না জোটে আমরা মা'কে ভিক্ষে করে খাওয়াবো। ঠাকুর চলে গেছেন বলে কি মা'র দুর্দশা হবে। তা কখনই হতে দেব না। কিন্তু শ্রীমা বুদ্ধিমতী; ছেলেদের অবস্থা বুঝেই তিনি তখনকার মতো বলরাম বসুর বাড়িতে এসে থাকতে লাগলেন। থাকতে লাগলেন সম্পূর্ণ সধবার বেশে। সরু লাল পেড়ে কাপড় হাতে স্বামীর দেওয়া সেই সোনার ডায়মনকাটা বালা—এই বেশেই তিনি চৌত্রিশ বছর কাল ছিলেন এই পৃথিবীতে যুগাবতারের প্রতিনিধি হিসেবে। তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সারদা, এখন থেকে তিনি হলেন সকলের শ্রীমা। মহিমাময়ী এই মাতৃত্বেই তাঁকে নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন যুগদেবতা রামকৃষ্ণ। এখন থেকে শুরু হয় সারদামণির জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

পাঁচ

১৮৮৬ (বাংলা ১২৯৩), ১৫ই ভাদ্র।

শ্রীমা বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। সঙ্গে গোলাপ-মা, লক্ষ্মী দিদি, যোগীন মহারাজ, কালী মহারাজ ও লাটু মহারাজ। ঠাকুর একবার শ্রীমাকে বলেছিলেন, আমি যেসব তীর্থে যাইনি তুমি ছেলেদের সঙ্গে সেই সব দেখে এসো। তাই তিনি দেহরক্ষা করলে মায়ের মনটা বড় খারাপ হয়। তিনি বেরিয়ে পড়লেন তীর্থভ্রমণে।

প্রথমে এলেন দেওঘরে। তারপর কাশী। এখানে দিন তিনেক অবস্থান করে এলেন বৃন্দাবন ধামে। ট্রেনে যাচ্ছেন। ঠাকুরের হাতে যে সোনার কবচটা ছিল সেটি তাঁর অসুখের সময় মাকে দিয়েছিলেন। তিনি সেটি ধারণ করেছিলেন। কেবল পরা নয় রোজ সেটি জলে ধুয়ে সেই জল পান করতেন। কবচটি পুজোও করতেন ঠাকুরের একখানি ছোট পটের সঙ্গে।

ট্রেন চলেছে হু হু করে। জয়রামবাটি, কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, সেখানে নহবতখানা, তারপর কলকাতার শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাসাবাড়ি, অবশেষে কাশীপুরের বাগান বাড়ি—মায়ের স্মৃতি পর্দায় একটার পর একটা ভেসে ওঠে এই সব অতীত দিনের ছবি। গাড়ির ঝাঁকানিতে

ঘুম আসে। বেঞ্চিতে শয্যা নিলেন। বাঁ হাতটা রাখলেন জানালার ওপর। হাতে সোনার কবচটি দেখা যাচ্ছিল। ঠাকুরের অশরীরী মূর্তি দেখতে পেলেন ঐ কবচটিতে। তখনি শুনতে পেলেন ঠাকুর বলছেন ওগো, তোমার হাতটা জানালার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। কবচটা দেখা যাচ্ছে। চোর যদি চুরি করে! শ্রীমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন। কবচটি তখনি হাত থেকে খুলে টিনের বাক্সে রাখলেন।

এলেন কাশীতে। মকরবাহিনী গঙ্গার তীরে শিবধাম কাশী। স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে দেখা হলো শ্রীমা'র। তাঁকে খুব ভাল লাগল তাঁর। ছেলেদের বললেন, এমন সাধু বড় একটা দেখা যায় না। কাশীর পরে বৃন্দাবন ধাম। এখানে এসে শ্রীমা ও যোগেন-মা কান্না শুরু করে দিলেন। ঠাকুর দেখা দিয়ে তাঁদের দু'জনকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁরা শান্ত হলেন।

শ্রীমা বৃন্দাবনে ছিলেন এক বছর। মধ্যে একবার যোগানন্দকে সঙ্গে করে হরিদ্বারে গিয়ে ব্রহ্ম কুণ্ডে ঠাকুরের নখ ও চুল দেন এবং জয়পুর হয়ে ফিরে আসেন বৃন্দাবনে। এখানে থাকতেন কালাবাবুর কুঞ্জে। বৃন্দাবনে সব বাড়িই কুঞ্জ। একদিন দেখতে পেলেন, একটি লোক মারা গেছে। তাকে নিয়ে চলেছে শ্মশানে। সঙ্গে একদল কীর্তনীয়া হরিনাম করতে করতে চলেছে। শ্রীমা ভক্তদের দেখিয়ে বলেন, ছ্যাখো, কি ভাগ্য ওর। ও বৃন্দাবন-প্রাপ্ত হয়েছে। আর আমরা এখানে কি করতে এলুম।

দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরে থাকতেই মায়ের শরীরে বাত ধরেছিল। এ আর সারেনি। কখনো বাড়ে, কখনো কমে। বৃন্দাবনে আসার কয়েক মাস পরেই দেখা দিল বাতের অসহ্য যন্ত্রণা। তবু তিনি তীর্থের বিভিন্ন স্থান—শ্যাম কুণ্ড, রাধা কুণ্ড, গিরি-গোবর্ধন ইত্যাদি—ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। মন্দিরে মন্দিরে এসে দর্শন করে রাধারানী ও শ্যামসুন্দরের বিগ্রহকে। গোবিন্দজীর মন্দিরে সন্ধ্যাবেলায় আরতি দেখে খুব ভাল লাগে। মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে ভাবের উদয় হতো। অনেক সময়

সমাধিও হতো। সেইজন্যই তো সর্বদা মায়ের দেখাশুনা করতেন যোগীন মহারাজ। ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীমা বৃন্দাবনে এঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন।

কালাবাবুর কুঞ্জে আছেন শ্রীমা। একদিন গৌর শিরোমনি এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেরুয়া নিয়েছেন। মাকে একটা প্রণামও করলেন না। মনে খুব অহং ভাব। তিনি চলে গেলে, মা বললেন, সন্ন্যাসী হয়েছে বলে দেমাক আর ধরে না। আমার শাদা কাপড়ই ভাল। দরকার নেই গেরুয়া পরে। তাছাড়া ত্যাগটা আসলে মনে, বাইরে নয়। বৃন্দাবনে থাকার সময় শ্রীমা বেশি ঘুমুতেন না। দিনরাত নাম জপ করতেন। বলতেন, ঘুম আমার আসে না। মনে হয় যতক্ষণ ঘুমুবো ততক্ষণ যদি নাম জপ করি তাহলে ছেলেদের ভাল হবে। উঠতেন তিনি রাত তিনটার সময়। নহবতে থাকতে এই অভ্যাসটা তাঁর হয়েছিল আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল।

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হলো। এবার ফেরার পালা। আসার সময় প্রয়াগ হয়ে এলেন। এখানে ঠাকুরের বাকী নখ ও চুল গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে নিজের হাতে নিক্ষেপ করলেন। বৃন্দাবনে থাকতেই মা খবর পেয়েছিলেন, তাঁর মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। ভবতারিনীর জমিদারী থেকে তিনি সাতটি করে টাকা পেতেন প্রতি মাসে। নতুন খাজাঞ্চি এসে সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই শুনে শ্রীমা বললেন, বন্ধ হয়েছে হোক। অমন সোনার ঠাকুর চলে গেলেন আর আমি তুচ্ছ কয়েকটা টাকা নিয়ে কি করব।

বৃন্দাবন থেকে মা এলেন কলকাতায়। বলরামের বাড়িতে কিছু দিন থেকে চলে এলেন কামারপুকুরে। পুরো পথের গাড়ি ভাড়া জুটল না। শেষ ষোল মাইল পথ হেঁটে চলে এলেন। এখানেও তিনি প্রায়ই ঠাকুরের দেখা পেতেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, তুমি কামারপুকুরে থাকবে। শাক বুনবে; শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম

করবে। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেন শ্রীমা এই সময় সেই ভাবেই জীবনযাপন করতেন। এমন দিন গিয়েছে বাড়িতে অপর কেউ থাকত না। দুটি ভাত সিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু নুন জোটেনি। তখন যোগীন মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি যাঁরা পরে মায়ের দেখাশুনার ভার নিয়েছিলেন, তাঁরা তীর্থভ্রমণে গেছেন বৈরাগ্যের প্রেরণায়। মাথায় মাখবার তেল পর্যন্ত জুটত না।

'আমাদের এ ধারণাই তখন ছিল না যে, মার নুনটুকুও জোটে নি। এই কথা পরে বলতেন শরৎ মহারাজ। শুধু কি নুন? পয়সার অভাবে ময়লা কাপড়ে সাবান দিতে পারতেন না। আলুনি ভাত আর শাক খেয়ে দিন কাটে তবু বাপের বাড়ি যান না। মা শ্যামাসুন্দরী কতবার বলেছেন, আমার কাছে চলে আয়, তোর বড় কষ্ট হচ্ছে। শ্রীমা শোনেন নি সে কথা। তাঁর জীবন দেবতার আদেশ, শাক-ভাত খেয়ে কামারপুকুরে থাকবে। সে আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

প্রায় এক বছর কামারপুকুরে থাকবার পর ভক্তেরা মাকে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটে বাড়িতে প্রায় ছয় মাস কাল এনে রাখলেন। পরে কার্তিক মাসে সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় বলরাম বাবুর বাড়িতে দুই-একদিন থেকে মা পুরী যাত্রা করেন। তখনো রেল হয়নি। চাঁদবালি পর্যন্ত জাহাজে, সেখান থেকে কটক পর্যন্ত স্টীমারে এবং বাকী পথটা গোরুর গাড়িতে যেতে হয়েছিল। পুরীতে বলরাম বাবুর একটা বাড়ি ছিল। যে চার মাস তিনি পুরীতে ছিলেন, মা এই বাড়িতে থাকতেন। বলরাম বাবুর পুরীতে খুব নাম-ডাক, মা তাঁর বাড়িতে আছেন। সেই সুবাদে পাণ্ডা গোবিন্দ শিঙ্গারী তাঁকে পালকি করে জগন্নাথ দর্শনে নিয়ে যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাতে মা বলেছিলেন, না গোবিন্দ। তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলবে, আমি দীনহীন কাঙালিনীর মতো তোমার পেছনে পেছনে জগন্নাথ দর্শনে যাব।

এই নইলে কি আর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী।

বাগবাজারে মায়ের নিজস্ব বাড়ি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত, তিনি কলকাতা, কামারপুকুর ও জয়রামবাটিতে থাকতেন। একবার দেড় বছর বাগবাজার স্ট্রীটের একটা ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন। তবে কামারপুকুরের কথা শ্রীমা কোনদিন ভোলেননি। ঠাকুর একবার তাঁকে বলেছিলেন, ভক্তেরা যে যতই করুক, অট্টালিকা দিক আর রাজপ্রাসাদ দিক, তুমি কিন্তু কামারপুকুরের কথা ভুলো না কোনদিন।

শ্রীমা ভোলেননি স্বামীর ভিটার কথা। তবে তিনি সেখানে যেতেন খুব কম। কলকাতায় মায়ের বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাপের বাড়িতেই থাকতেন বেশি সময়। কেননা ঠাকুরের অবর্তমানে কামারপুকুর তাঁর কাছে নিতান্তই শূন্য লাগে। শূন্য, শ্রীহীন মন্দির। দেবতাহীন গৃহ। কার কাছে যাবেন। কে আছে ওখানে? জয়রামবাটিতে ঘনঘন আসার একটা কারণ ছিল। মায়ের চার ভাই। প্রত্যেকের মধ্যে ঝগড়া, মনোমালিন্য লেগেই থাকত। পৈতৃক বিষয় নিয়ে গণ্ডগোল চলছিল। শ্যামাসুন্দরীর মৃত্যুর পর সে গণ্ডগোল সপ্তমে উঠলো।

তখন ভায়েরা দিদিকে সালিশী মানলেন তাঁদের ঝগড়া মিটিয়ে দেবার জন্য। তখন শ্রীমা চার ভাইকে সমানভাবে পৈতৃক বিষয় ভাগ করে দিলেন। কিন্তু তাতেও ঝগড়া থামল না। মাঝে মাঝে ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি বাধলে দিদি এসে ঝগড়া থামিয়ে দিতেন। একদিন তিনি হাসতে হাসতে বললেন। মানুষ ক'দিন বা পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, তার জন্য এত লাঠালাঠি।

ছোট ভাই অভয়চরণ একদিন বললেন, 'দিদি, আমাদের ঘরের কাছাকাছি একটা ঘর তুলে দিই, তুমি নিরিবিলি সেইখানেই থাক, কোথায় আর যাবে'। কথাটা মায়ের মনঃপুত হলো। একখানা চালাঘর তৈরি হলো তাঁর জন্য; খরচটা চার ভাইতে মিলেই দিলেন।

তার মধ্যে বেশ আনন্দে দিন কাটতে লাগল তাঁর। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে কোন ভক্ত এলে সেখানে উঠত।

মা জয়রামবাটিতে আছেন। ভক্তদের মধ্যে এই খবর জানাজানি হয়ে গেলে তাঁরা মায়ের সেবার জন্য প্রচুর সিধে পাঠাতেন। সেই সময় মায়ের অবস্থা বেশ সচ্ছল হয়েছিল বলা যায়। তাই দেখে তাঁর ভায়েরা দিদির খুব খোশামোদ করতে থাকে। একভাই বললেন, তুমি অমূল্য রত্ন দিদি। কত জন্মের তপস্যায় তোমাকে দিদিরূপে পেয়েছি---পরের জন্মেও তুমি যে আমাদের দিদি হয়ে সংসারে এসো।

ভাইদের কথা শুনে তিনি অবাক। সংসারে তাদের ঘোর আসক্তি দেখে বলতেন, রক্ষে করো আবার তোমাদের সংসারে আসব। মা-বাবা ভাল ছিলেন বলে তাই এসেছি। আর নয়, খুব হয়েছে। কিন্তু নিয়তি তাঁকে এই সংসার থেকে যেতে দিল না। ছোট ভাইয়ের নাম অভয়চরণ। সুরবালা তার স্ত্রীর নাম। অভয় একটি মেয়ে আর স্ত্রী রেখে মারা গেলেন। মরবার সময় দিদির হাতে স্ত্রী আর মেয়ের ভার দিয়ে গেলেন। ঐ মেয়েটির নাম রাধারাণী। শ্রীমা ওকে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করলেন। তাকে আদর করে ডাকতেন রাধু বলে। ঠাকুর থাকতেই সারদামণি তাঁর এই ভাইঝিটির মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।

রাধু ছিল শ্রীমার চোখের মণি। সেই রাধু একদিন তাঁর অসুখের সময় তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল। শ্বশুরবাড়িতে এলো। যখন রাধু চলে আসে তখন তাকে লক্ষ্য করে শ্রীমা বলেছিলেন, আমাকে একা ফেলে চললি?

—তুমি এখানে একা থাকবে কেন? তোমার এখানে কত লোকজন, কত শিষ্য তোমার। আর আমার ওখানে আছে শুধু স্বামী। আমাকে দেখতে সেই একজন ছাড়া আর কেউ নেই।

শ্রীমা আর কিছু বললেন না। তাঁর মতামত না নিয়েই রাধু চলে গেল। এদিকে রাধুর মা পাগলী সুরবালা এসে হাজির হলো শ্রীমার

কাছে। বললে, তোমার তো আরো কাজ আছে। তারা কত ভাল। তুমি তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকো না কেন? শুধু আমার রাধুর ওপর এত নজর কেন?

--আমি রাধুর কেউ নই। তুমিই রাধুর মা। রাধু তোমারই। আমি আর কদিন আছি! আমি চলে গেলে রাধু তোমার কাছেই থাকবে।

সুরবালা তবু শুনল না। অকথ্য গালিগালাজ দিতে থাকে। মা তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। বাপের বাড়ি চলে গেল সুরবালা। সঙ্গে নিয়ে গেল নিজের আর রাধুর সব গয়না। সুরবালার বাবা মেয়ের কাছ থেকে সমস্ত গয়না আত্মসাৎ করলেন। চিঠি এলো সুরবালার. মহামুস্কিলে পড়লেন শ্রীমা। পাগলীর বাবাকে ডেকে পাঠালেন জয়রামবাটিতে। অনেক সাধ্য-সাধনা করলেন। এমন কি পায়ে ধরলেন পর্যন্ত। তবু সুরবালার বাবা ফিরিয়ে দিল না গয়নাগুলো।

তখন তিনি কলকাতায় মাস্টার মশাইকে, চিঠি লিখলেন ও শীঘ্র একবার জয়রামবাটিতে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁর এক বন্ধু ললিত চাটুজ্যেকে নিয়ে মাস্টার মশাই চলে এলেন জয়রামবাটিতে। পরে গেলেন সুরবালার বাপের বাড়ি মাজুটে গ্রামে। তারপর ললিত-বাবু কোর্ট পুলিশের ভয় দেখাতে ব্রাহ্মণ সব গয়না বের করে দিলেন। সুরবালা নির্ঝঞ্ঝাটে সব গয়না পেয়ে গেছে শুনে শ্রীমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। মনে মনে বললেন, ঠাকুর আর কত কি দেখাবে তুমি! সবই তোমার লীলা, লীলাময়।

গিরীশ ঘোষ ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত ভৈরব। তিনি তার সব পাপ গ্রহণ করেছিলেন। একবার গিরীশের যখন কলেরা হয় তখন তিনি

১ 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের যশস্বী লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্তদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীমা অনেক সময় কলকাতায় তাঁর বাড়িতে বাস করতেন। শ্রীমাকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন।

মাথার কাছে এক অপরূপ মাতৃমূর্তি দেখেছিলেন। সেই হাসিভরা করুণা মাখানো মুখখানি আবার দেখবার জন্য তিনি খুব অস্থির হলেন। কিন্তু স্বপ্নে দেখা মুখ তাঁর নজরে পড়ল না। এমন কি কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে সেখানকার মাকে দেখেও তাঁর বাসনা পূর্ণ হলো না। তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ একদিন গিরীশকে বললেন, চলুন আমার সঙ্গে একবার জয়রামবাটিতে শ্রীমার কাছে। গিরীশ এলেন। শ্রীমাকে দেখেই চিনতে পারলেন। এই তো সেই স্বপ্নে দেখা মা। লুটিয়ে পড়েন মায়ের পায়ে। বলেন, মা, তুমি আমার সত্যি মা, না পাতানো মা ?

—আমি সত্যিকারের মা। পাতানো মা নয়।

—তা হলে তোমার করুণা এই অধম সন্তান পাবে ?

—ঠাকুর কত ভালবাসতেন আপনাকে, সে কথা সবাই জানে।

—মা, আমি সন্ন্যাস নিতে চাই।

—যা করছেন, তাই করুন বাবা। ঠাকুর তো আপনাকে সংসার ছাড়তে বলেন নি।

গিরীশ আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। আসবার সময় বলে এলেন, সামনের দুর্গাপূজায় আপনাকে আসতে হবে ছেলের বাড়িতে। মা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। কিন্তু পূজোর সময় তিনি পড়লেন অসুখে। তবু কলকাতায় না গিয়ে পারলেন না। গিরীশবাবু যে ঠাকুরের বীরভক্ত। তাঁর বাড়িতে যেতেই হবে। জয়রামবাটি থেকে এলেন বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়িতে। পূজোর সময় এলেন গিরীশবাবুর বাড়িতে। মাকে কাছে পেয়ে গিরীশের মনে আনন্দ আর ধরে না। মাটির মা'র সঙ্গে জীবন্ত মায়ের মিলনে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ভক্ত গিরীশ মনে-প্রাণে অকল্পনীয় আনন্দ উপলব্ধি করে ধন্য হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রাখলে সারদাদেবী চৌত্রিশ বছর ধরে ভক্তদের মধ্যে লীলা করেছেন নানা ভাবে। তিনি বলতেন, ভক্তদের জন্যই তো

ঠাকুর তাঁকে রেখে গেছেন। একবার জীবদ্দশায় রামকৃষ্ণ শ্রীমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি কি করেছি। তোমাকে এর চেয়ে বেশি কাজ করতে হবে আর তা করতে হবে অনেক দিন ধরে। শ্রীমা জানতেন, তাঁর প্রাণের দেবতা এসেছিলেন জীবের দুঃখ নাশ করতে; তাদের পাপতাপ হরণ করতে। সেই দায় এখন তিনি মনের আনন্দে বহন করে চলেছেন।

শ্রীমা'র কাছে অনেক রকম ভক্ত আসতো। কেউ সংসারী, কেউ বা সংসার-বিবাগী। ঠাকুরের মতো তিনিও সন্ন্যাসী বা গেরুয়াধারী ভক্তদের তুলনায় সংসারী ভক্তদের দিকে বেশি করে নজর দিতেন। বলতেন, ওদের কি ভয়! ওরা তো সংসার ত্যাগ করে বসে আছে। ভগবানকে ডাকার জন্যই তো সংসার ছেড়েছে। আমার ভাবনা সংসারী ভক্তদের নিয়ে। ওরা সংসার নিয়ে ব্যস্ত। ঈশ্বরকে ডাকবার সময় পায় না। আমি রয়েছি তাদের সবাইকে ভগবানের পথে ঠেলে দিতে।

ঠাকুরের মতো শ্রীমায়েরও অনেক ভক্ত। ঠাকুরের অসমাপ্ত কাজ শ্রীমাকেই শেষ করতে হয়। যতদিন যায়, দেশ-বিদেশ থেকে আসে শত শত ভক্ত মায়ের কাছে। কল্যাণময়ী মূর্তিতে তিনি সবাইকে বুকে টেনে নিতেন। সকলের দুঃখেই তাঁর প্রাণ কাঁদত, সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতেন। এইভাবেই জীবনের বাকী চৌত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি হিসেবে।

ছয়

আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে কয়েকটি বিদেশিনী শিষ্যাকে এদেশে এনেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এঁদের মধ্যে একজন শ্রীমায়ের খুব প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন। তিনি নিবেদিতা। আগে তাঁর নাম ছিল কুমারী এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল। ইনি ছিলেন বিবেকানন্দের মানসকন্যা। এই দেশকেই তিনি তাঁর নিজের দেশ বলে মনে করতেন। নরেন্দ্রনাথের এই মানস কন্যাটিকে শ্রীমা কিরকম স্নেহ করতেন, সেই ইতিহাস এইবার বলব।

কলকাতার মেয়েদের জন্য একটা ভাল স্কুল কবার পরিকল্পনা ছিল স্বামীজির। নিবেদিতাকে তিনি সেই কাজের ভার দিয়েছিলেন। স্কুল স্থাপিত হওয়ার আগে তিনি শিষ্যাকে কিছুকাল শ্রীমা'র কাছে রেখে দিয়েছিলেন। বাগবাজারের একটা বাড়িতে তখন সারদাদেবী স্ত্রী-ভক্তদের সঙ্গে বাস করতেন। বেলুড় থেকে বিবেকানন্দ একদিন নিবেদিতাকে নিয়ে এলেন বাগবাজারে। শ্রীমায়ের কাছে একটা খালি ঘরে বাস করবার অনুমতি পেলেন নিবেদিতা। হিন্দু পাড়ায়, হিন্দুর বাড়িতে একজন মেমসাহেবের থাকা পাড়ার লোকদের পছন্দ হয় না। শ্রীমাকে এজন্য প্রতিবেশীর বিরুদ্ধ সমালোচনা পর্যন্ত শুনতে হতো।

তাঁর জন্য সঙ্ঘ-জননী বিব্রত বোধ করবেন, নিবেদিতা এটা চাইলেন না। গুরুকে তিনি সব কথা খুলে বললেন। তখন স্বামীজি আট-দশ দিনের মধ্যেই শ্রীমা'র বাড়ির খুব কাছে শিষ্যার থাকবার জন্য একটা বাড়ি ঠিক করে দিলেন। তখন গরমের দিন। নিবেদিতা যে বাড়িতে থাকতেন, সেখানে বাতাসের অভাবে তাঁর কষ্ট হয় জানতে পেরে শ্রীমা রাত্রিবেলায় নিবেদিতাকে তাঁর ঘরেই শুতে বললেন। লাল সুরকির পালিশ করা মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে শুতেন নিবেদিতা। শোবার বন্দোবস্ত ভাল ছিল বলে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ তিনি বোধ করতেন সারদাদেবীর কাছে থাকতে পাওয়ার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন বলে।

সঙ্ঘ-জননীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করে এই প্রথম নিবেদিতা তাঁকে বুঝবার ও জানবার সুযোগ পেলেন। এই দেবীচরিত্রের মাধুর্য ও সৌন্দর্য দেখে নিবেদিতার সমস্ত অন্তর শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে ভরে উঠতো। শ্রীমায়ের স্নেহের নিবিড় স্পর্শ লাভ করে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করলেন। সারদাদেবীর মধ্যে মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা দেখে, সময় সময় নিবেদিতার মনে হতো —ভারতীয় নারীকুলের আদর্শের শেষ কথা বুঝি ইনিই।

১৮৯৮, ১২ই নভেম্বর। দীপান্বিতার পুণ্যতিথি।

ঐ দিন বাগবাজারে সতেরো নম্বর বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই উৎসবকে স্মরণীয় করবার জন্য স্বামীজি বেলুড় থেকে এসেছিলেন সঙ্ঘ-মাতাকে নিয়ে। তাঁর ইচ্ছা শ্রীমা এই স্কুলের উদ্বোধন করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দও এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীমা মাঝে মাঝে স্কুল দেখতে আসতেন। একা আসতেন না—যোগীন-মা, গোলাপ মা, গোপালের মা প্রভৃতি মায়ের মেয়ে ভক্তগণ সঙ্গে থাকতেন। স্কুলে একটা ঠাকুর ঘর ছিল। ধূপধুনোর পবিত্র গন্ধে ঘরখানি যেমন আমোদিত তেমনি পরিচ্ছন্ন। এত সুন্দর

ঠাকুর ঘর! তাঁরা তো দেখে অবাক। সারদাদেবী ও তাঁর ভক্ত সঙ্গিনীরা এসে ঠাকুর ঘরে বসলেন। সেদিন খ্রীস্টানদের ঈস্টার পর্বের দিন ছিল। শ্রীমা এই পর্ব সম্বন্ধে দু'চারটি কথা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ঠাকুর ঘরের এক কোণে ছিল ছোট্ট একটি অর্গান। সেইটি বাজিয়ে একটি ঈস্টারের গান গাইলেন নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে। তারপর গানটির মানে বুঝিয়ে দিলেন। তখন তিনি বেশ বাংলা বলতে শিখেছেন। ঈশ্বরের সন্তান যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কিত এই স্তোত্রটি বিদেশী ভাষায় গাওয়া হলেও সেটি শুনে শ্রীমা খুব আনন্দিত হলেন।

১৯০২ সালে বিবেকানন্দের অকালমৃত্যুর পর শ্রীমা সর্বদাই নিবেদিতার খোঁজ খবর নিতেন। তার প্রশংসায় তিনি যেন পঞ্চমুখ ছিলেন। ভক্তদের কাছে বলতেন, ও আর জন্মে হিন্দু ছিল। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছে। নিজের মেয়ের মতো তাঁর আদর-যত্ন করতেন। নিবেদিতা যখনি তাঁর কাছে আসত পাশে বসিয়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন নিবেদিতা এসে মাকে প্রণাম করে বসলে, শ্রীমা কুশল প্রশ্নের পর পশমের তৈরী একখানা ছোট পাখা তাঁকে দিয়ে বললেন খুকি, আমি এ খানি তোমার জন্যে করেছি। সারদাদেবী তাঁকে আদর করে 'খুকী' বলে ডাকতেন।

নিবেদিতা সেটি পেয়ে একবার মাথায় ঠেকান, একবার বুকে রাখেন আর বলেন, কি সুন্দর, কি চমৎকার। তাই দেখে মায়ের কি আনন্দ। একজন ভক্ত যখন জিজ্ঞাসা করে মেমসাহেব হয়ে উনি এদেশে এসেছেন কেন? আর বাগবাজারের মতো এমন জায়গায় স্কুল করে বাস করছেন কেন? তার উত্তরে শ্রীমা বলতেন, নরেনকে কি ভক্তিই করত। নরেন এদেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের ওপরই বা কি ভালবাসা! নিবেদিতা শ্রীমাকে জার্মান সিলভারের একটা কৌটো দিয়েছিলেন। শ্রীমা তার মধ্যে ঠাকুরের মাথার চুল রাখতেন।

বলতেন, পুজোর সময় কৌটোটা দেখলেই নিবেদিতার কথা মনে পড়ে।

এক দিন। বিকেলবেলা। সারদা দেবী উদ্বোধনে আছেন। নিবেদিতা প্রণাম করতে এলেন। শ্রীমা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, খুকি, আমি তোমাকে স্বপ্নে গেরুয়া-পরা অবস্থায় দেখেছি। তোমার তো সম্পূর্ণ দীক্ষা হয়নি। আমার কাছে দীক্ষা নেবে ?

—নতুন করে আর গেরুয়া পরব না। স্বামীজি আমাকে সন্ন্যাস দিয়ে গেছেন। আমি সেই ভাবেই চলব।

—কি অসাধারণ তোমার গুরুভক্তি। ধন্যি মেয়ে তুমি।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে দার্জিলিঙ-এ নিবেদিতার মৃত্যু হলো। উদ্বোধনে বসে শ্রীমা সেই খবর পেলেন। দু'বছর আগে ছেলেরা মায়ের থাকবার জন্য বাগবাজারে গঙ্গার ধারে এই বাড়িটা তৈরি করান। বাড়ির নাম উদ্বোধন। তখন থেকে সারদাদেবী উদ্বোধনের মা, এই নামে অনেকের কাছে পরিচিতা হন। খবর শুনে তিনি খুব ব্যথিত হলেন। সবাই দেখলো মায়ের দুই চোখ বেয়ে ঝরছে শোকাশ্রু। বললেন, ঠাকুর রেখে গিয়েছিলেন আমাকে আর নরেন রেখে গিয়েছিল খুকীকে।

সেদিন ভক্তরা দেখা করতে এলে শ্রীমা অন্য প্রসঙ্গ তুললেন না; শুধু নিবেদিতার কথাই বললেন সকলকে। বললেন, আহা নিবেদিতার কি ভক্তিই ছিল। আমার জন্য যে কি করবে ভেবে পেত না। রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। প্রণাম করে নিজের রুমাল দিয়ে কত সন্তর্পণে আমার পায়ের ধুলো নিত। দেখতুম যেন পায়ে হাত দিতেও সংকুচিত হচ্ছে। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, এত অল্প বয়সে চলে গেল। মনে আছে তার স্কুলে একবার সরস্বতী পুজোর দিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। গিয়ে দেখি খুকী

খালি পায়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে ঘুরছে। সত্যি সে যেন এই দেশেরই ছিল। আজ সবাই তার জন্য কাঁদছে। কাঁদবেই তো। যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী।

শ্রীমা আবার তীর্থযাত্রায় বেরুলেন।

গোলাপ-মা, যোগেন-মা, রাধু প্রভৃতিদের সঙ্গে নিয়ে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী, বিষ্ণুপুর, সেতুবন্ধ রামেশ্বর ঘুরে এলেন। গয়াতে এসে ঠাকুরের কথা মনে পড়ল। তিনি এই তীর্থে আসেন নি। মা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, গয়াতে গেলে না কেন? উত্তরে ঠাকুরে বলেছিলেন, ওখান থেকেই তো এসেছি ওখানে গেলে কি আর ফিরতে পারতাম। আমার জন্য সেজবাবুর ঐ তীর্থটা দর্শন করা হয়নি।

পুরীতে এসে শ্রীমা প্রথমে গেলেন জগন্নাথ মন্দিরে। এবার কিন্তু চোখ বন্ধ করে বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালেন। আগে তাঁর স্বামী-দেবতাকে দেখাবেন বিশ্বপতিকে। তারপর দেখবেন নিজে। তাঁর সঙ্গে ছিল ঠাকুরের ছোট্ট একখানা ফটো। শ্রীমা সেই ফটোটি বুকের মধ্যে রেখেছিলেন। সেইটি তিনি খুলে ধরলেন মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথদেবের সামনে। তারপর চোখ খুলে প্রাণভরে দেখে নিলেন বিশ্বপতিকে। দেখলেন, এক অপূর্ব দৃশ্য। জগন্নাথ যে বেদীর ওপর ছিলেন সেখানে তিনি নেই। তাঁর জায়গায় রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন শ্রীমা যুক্তকরে প্রণাম নিবেদন করে ধীর শান্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে।

যা কিছু তীর্থ ভ্রমণ তা ঠাকুরের তিরোধানের পর শ্রীমা শেষ করেছিলেন। তাঁর ছেলেরাই এজন্য সব ব্যবস্থা করতেন, সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন ; এমন তাঁদের দু'একজন সব সময় তাঁর সঙ্গে থেকে মায়ের দেখাশুনা করতেন। তাঁদের গুরু ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ বলে গেছেন, ওরে, জীবন দিয়ে তোরা সব সময়ে মাকে আগলে থাকবি— তাঁর যেন একটুও অসুবিধা বা কষ্ট না হয়। আমেরিকা থেকে

মায়ের জন্য তিনি টাকা পাঠাতেন যাতে তাড়াতাড়ি কলকাতায় মায়ের একটা আস্তানা তৈরি হয়। রাখাল, শশী, শরৎ, তারক সকলেই মা-অন্ত প্রাণ ছিলেন। কিসে মা সুখে থাকেন সেই দিকে তাঁরা সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখতেন। কলকাতা, কামারপুকুর কি জয়রামবাটি যখন যেখানে শ্রীমা থাকতেন তখন তাঁর আরামের দিকে সকলের প্রখর দৃষ্টি থাকত। ১৯১৫ সালে জয়রামবাটিতে মায়ের জন্য আলাদা একটা বাড়ি তৈরি হয়—মাটির কোঠা, খড়ের চাল। তখন থেকে মা যখনি দেশে যেতেন, এই নতুন বাড়িতেই থাকতেন।

মাতাল পদ্মবিনোদকে সবাই চেনে। বাগবাজারের এই নামকরা মাতাল গিরীশ ঘোষের থিয়েটারে অভিনয় করতো। শ্রীমা যখন ভক্তদের নিয়ে বলরাম বোসের বাড়িতে ছিলেন সেই সময় পদ্মবিনোদ একদিন অনেক রাতে মাকে দেখতে এলো। মাতাল হয়ে এসেছে। নীচে থেকেই ডাকছে, মা, তোমার ছেলে এসেছে, ওঠো। বলেই গান ধরলে—

'ওঠো গো করুণাময়ী, খোলো গো কুটীর দ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার।'

সবাই মন দিয়ে মাতালের গান শোনে, কিন্তু কেউ ভয়ে দরজা খুলে দিলে না। কি জানি, পদ্মবিনোদ ঘরে ঢুকে যদি মাতলামি শুরু করে। রাতও হয়েছে অনেক। কিন্তু করুণাময়ী শ্রীমা'র অন্তর স্নেহে বিগলিত হয়। স্থির থাকতে পারলেন না তিনি। নিজেই উঠে এসে দরজা খুলে দিলেন। পদ্মবিনোদ মাকে দেখামাত্র দূর থেকে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলে। আবার গান ধরে—

'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন, তুমি ছ্যাখো আর আমি দেখি
আর যেন কেউ না দেখে।'

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত শ্রীমা পদ্মবিনোদের গান শুনলেন। প্রসাদ খেয়ে সে খুশি হয়ে চলে গেল। একজন ভক্ত যখন প্রশ্ন করল, মা,

কাজটা কি ঠিক হলো? তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন; ওরা আমার কাছে যদি না আসবে তবে কার কাছে যাবে? আমি ওদের আমি বাদ দিতে পারি না। ঠাকুর বলতেন, এবার আমি কাউকে ছাড়ছি না। তিনিও তো গিরীশবাবুর মত মাতালকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনীর উপযুক্ত কথা বটে!

জয়রামবাটিতে এক চৌকিদার ছিল। বাপের বাড়ির সুবাদে ছেলেবেলা থেকেই মা তাকে ডাকতেন অম্বিকা দাদা বলে। জাতে বাগ্‌দি। তাই সবাই ডাকতো অম্বিকা বাগ্‌দি বলে। সে অম্বিকা একদিন এসে বললে শ্রীমাকে, লোকে এখন আপনাকে দেবী, ভগবতী কত কি বলে। কৈ আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।

আমাকে আর বুঝে কাজ নেই। তুমি আমার সেই অম্বিকা দাদা।

মায়ের প্রসন্ন বদনে স্নিগ্ধ হাসটুকু দেখে ভরে ওঠে সরল বাগ্‌দি সন্তানের হৃদয়। তেমান ভক্ত চন্দ্র দত্তও একবার শ্রীমাকে বলেছিল, মা, দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক আসে। দেখি তারা তোমাকে দেবীজ্ঞানে পূজো করে। কিন্তু আমি তো তোমার দেবীত্ব কিছুই বুঝতে পারি না।

—তুমি বেশ আছ চন্দ্র। বেশি বুঝে কাজ নেই।

—কেন মা?

—বেশি জেনে কি হবে? তখন তো বিচার আসবে। আর বিচার এলেই তো হারিয়ে ফেলবে মনের শান্তি। জানো না, ঠাকুর ভবতারিণীকে বলতেন, আমার বিচার-বুদ্ধির মাথায় পদাঘাত কর মা। মাকে মা বলে ডাকবে। এর বেশি আর দরকার কি?

এমনি সহজভাবে উচ্চজ্ঞানের কথা বলতেন শ্রীমা—ঠিক যেমন বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমায়ের কণ্ঠকে আশ্রয় করে ঠাকুরই যেন কথা বলতেন, নইলে ধর্মের কথা সকলের মর্মে পৌঁছে দেওয়া কি সোজা!

একদিন এক ভক্ত কথায় কথায় শ্রীমায়ের শ্বশুরের কথা জানতে

চাইলো। সারদাদেবী বললেন, আমার যে শ্বশুর ছিলেন, ওঁর মুখে শুনেছি, তিনি খুব তেজস্বী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেউ কোন জিনিস বাড়িতে দিতে এলেও নেবার নিষেধ ছিল। আমার শ্বাশুড়ীর কাছে কিন্তু কেউ কিছু লুকিয়ে এনে দিলে তিনি রেঁধেবেড়ে রঘুবীরকে ভোগ দিয়ে সকলকে প্রসাদ দিতেন। শ্বশুর তা জানতে পারলে রাগ করতেন। কিন্তু জ্বলন্ত ভক্তি ছিল তাঁর। ঠাকুর বলতেন, বাবার সঙ্গে সঙ্গে মা শীতলা ফিরতেন। শেষ রাতে উঠে ফুল তুলতে যাওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। একদিন লাহাবাবুদের বাগানে গিয়েছেন। একটি ন'বছরের মতো মেয়ে এসে তাঁকে বলছে, বাবা, এদিকে এস। এদিকের ডালে খুব ফুল আছে। আমি নুয়ে ধরছি, তুমি তোল। জিজ্ঞাসা করেন, এসময়ে এখানে তুমি কে মা? আমি গো, আমি এই হালদার বাড়ির। অমন ছিলেন বলেই না ভগবান তাঁর ঘরে এসে জন্মেছিলেন। একা নন, তাঁর এই সব সাঙ্গপাঙ্গরাও এসেছিল—নরেন রাখাল, তারক, কালী, বলরাম—কত বলব।

তখন সেই ভক্তটি জিজ্ঞাসা করেন, আপনিও তো সঙ্গে এসেছেন? শ্রীমা একথার কোন জবাব দিতেন না। লোক বিশেষ ছাড়া, নিজের স্বরূপ পরিচয় তিনি বড় একটা কাউকে দিতে চাইতেন না। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। তাই সব সময়ে তাঁর মুখে একটা কথা শোনা যেত আমি কি? ঠাকুরই সব।

যে সব স্ত্রী-ভক্ত বয়সে ছেলেমানুষ, যাঁরা তাঁকে কখনো দক্ষিণেশ্বরে দেখেননি, তাঁদের কেউ-কেউ কখনো কখনো মায়ের তখনকার জীবন একটু জানতে চাইত। একদিন একজন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনেছি আপনি নাকি খুব ভালো মালা গাঁথতে পারতেন? শ্রীমা হেসে বলতেন, মালা গাঁথা আমি বাপের বাড়ি থাকতেই বাবার কাছে শিখেছিলাম। দক্ষিণেশ্বরে থাকতে একদিন আমি রঙ্গন ফুল আর জুঁই ফুল দিয়ে সাতলহর গড়ে মালা গেঁথেছি। বিকেল বেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়িগুলো সব

ফুঠে উঠল। মাকে পরাতে পাঠিয়ে দিলুম। গয়না খুলে মাকে ফুলের মালা পরানো হয়েছে। এমন সময়ে ঠাকুর জগদম্বাকে দেখতে গিয়েছেন, দেখে একেবারে ভাবে বিভোর। বারবার বলতে লাগলেন, আহা, কালো রংয়ে কি সুন্দরই মানিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কে এমন মালা গেঁথেছে? একজন বললে আমার কথা। অমনি তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন দেখবার জন্য। গিয়ে দেখি, সত্য মালা প'রে মায়ের কি রূপ খুলেছে। আর দেখি মায়ের সামনে ঠাকুর ভাবে প্রেমে গান ধরে দিয়েছেন।

আর একদিন এক ভক্ত জানতে চাইলে দক্ষিণেশ্বরে নহবতে মায়ের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা—যা নিয়ে কত কিম্বদন্তী রচিত হয়েছে। তিনি অকপটে বললেন—আমার কথা কি বলবো, মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম। কোন হুঁশ থাকতো না। একদিন জোছনা রাতে নহবতে সিঁড়ির পাশে বসে জপ করছি। চারদিক নিস্তব্ধ। ঠাকুর যে সেদিন কখন ঝাউতলায় পৌঁছে গেছেন, কিছুই জানতে পারিনি—অন্যদিন জুতোর শব্দে টের পাই। তখন আমার অন্যরকম চেহারা ছিল—গয়না পরা, লাল পেড়ে শাড়ি। গা থেকে আঁচল খসে বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে, কোন হুঁশ নেই। ছেলে যোগেন সেদিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে গিয়ে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল। সে সব কি দিনই গিয়েছে। তখন কি মনই ছিল আমার। জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়হাত করে করে বলেছি, তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।

অসাধারণ হয়েও মা যে সাধারণের মতো থাকতেন, তার আসল রহস্যটা তো এইখানেই। শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন কোন বিষয়ই ভগবান ছাড়া ছিল না, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কোন বিষয়ই ছিল না সারদাদেবীর। অন্তর ও বাহির—তাঁর সমস্ত জগৎ ছিল রামকৃষ্ণময়।

সাত

একদিন এক ভক্ত এসে জিজ্ঞাসা করে, মা, আপনি দক্ষিণেশ্বরে কতদিন ছিলেন ?

—তা অনেকদিন ছিলাম। ষোল বছরের সময় এসেছি। সেই থেকে বরাবর ছিলাম। মাঝে বাড়ি যেতাম। দু-তিন বছর অন্তর যেতুম। রামলালের বিয়ের সময় গিয়েছিলাম।

—একা থাকতেন ?

—কখনো কখনো একা ছিলাম। আমার শাশুড়ী থাকতেন। মাঝে মাঝে গোলাপ, গৌরদাসী এরা সব থাকত। ঐটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা, খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হতো—প্রায়ই পেটের অসুখ ছিল কি না, কালীর ভোগ সহ্য হতো না। অন্যসব ভক্তদের জন্য রান্না হতো। লাটু ছিল—সে ময়দা ঠেসে দিত। তিন-চার সের ময়দার রুটি হতো। রাম দত্ত এলে তার জন্যে ছোলার ডাল হতো। তখন রাখাল থাকত—তার জন্যে প্রায়ই খিচুড়ি হতো। সুরেন মিত্তির মাসে মাসে ভক্তসেবায় দশ টাকা করে দিত। বুড়ো গোপাল বাজার করত। নাচ, গান, কীর্তন, ভাব, সমাধি দিনরাতই চলছে। সামনে বাঁশের চেটাইয়ের বেড়া দেওয়া ছিল। তাই ফুটো ফুটো করে দাঁড়িয়ে দেখতাম। তাই তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে বাত ধরে গেল।

দক্ষিণেশ্বরে সঙ্ঘ-জননীর প্রতিদিনের জীবন যাত্রা কেমন ছিল ?

এক কথায় অদ্ভুত। কিন্তু সেই জীবনে ছিল একটি ছন্দ, একটি সুর। সেই সুরে বাঁধা ছিল তাঁর জীবন, জীবনের প্রতিটি কর্ম। রাত তিনটা—চরাচর যখন ঘুমে অচেতন তখন থেকেই হতো তাঁর জীবনের কর্মধারা। সেই সময় তিনি ঘুম থেকে উঠতেন এবং প্রত্যূষে প্রথম দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো তাঁর জীবনদেবতার ছবির ওপর। যেন তাঁকে সাক্ষী রেখেই আরম্ভ হতো তাঁর দৈনন্দিন জীবন। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতো সেই জীবনের প্রতিটি কর্ম।

ঠাকুরদেবতার পবিত্র নাম মুখে নিয়ে শ্রীমা ঘুম থেকে উঠতেন। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে, আগের রাতে শয়ান দেওয়া ঠাকুর তুলতেন শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে। এই কাজটা সেরে জপে বসতেন। সেই যে দক্ষিণেশ্বরে থাকবার সময় শেষ রাতে উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে সকলের অজানিত ভাবে ঘরে ঢুকতেন, সেই অভ্যাস তাঁর সারাজীবন ছিল। যদি কোন দিন কোন কারণে শরীর খারাপ থাকত, তা'হলেও ঠিক সময়ে উঠে মুখ হাত ধুয়ে বরং পরে একটু শুয়ে নিতেন। তবু ঠিক সময়ে ওঠা চাই। এমন নিয়মনিষ্ঠা যা মুনিঋষি ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমা বলতেন, রাত তিনটে বাজলে যেখানেই থাকি, কানের কাছে যেন বাঁশীর ফুঁ শুনতে পেতুম। যখন যেটা করবার সেটা করতে তাঁর এতটুকু আলস্য ছিল না। স্বামীর জীবনের সঙ্গে সাধ্বী স্ত্রীর জীবনের একটা আশ্চর্য মিল ছিল।

দৈনন্দিন জীবনের দ্বিতীয় পর্বে পূজার আয়োজন। সকালের পূজার জন্য ফুল, বেলপাতা প্রভৃতি গুছিয়ে তামার থালায় সাজিয়ে রাখা, ফল ছাড়ান—এইসব কাজ মা নিজেই করে ঠিক আটটার সময় পূজায় বসতেন। জীবনের শেষের দিকে স্ত্রী-ভক্তরা এইসব কাজে তাঁকে সাহায্য করলেও তিনি নিজে যথাসাধ্য প্রায় রোজই করতেন। শরীর খুব অসুস্থ থাকলে, উদ্বোধনের সাধু বা ব্রহ্মচারীদের কেউ কেউ পূজা করতেন। মা নিজে যখন পূজা করতেন, এক ঘণ্টার মধ্যে পূজা

শেষ করে প্রসাদ দেওয়ার জন্য নিজের হাতে শালপাতা সাজাতেন ও সকলকে প্রসাদ দিতেন। কখনো কখনো কারো পূজায় স্তবস্তোত্র প্রভৃতি পাঠের জন্য অযথা দেরী হলে মা বিরক্ত হতেন। একদিন বলেছিলেন, আগে পূজা ও ভোগ সেরে নিয়ে যত পারে স্তব পাঠ করুক না। একি, লোক সব জল খেতে পায় না, বেলা হয়ে যায়। ঠিক সময়ে তাড়াতাড়ি কাজ করা—এটাই মা পছন্দ করতেন।

দুপুরের খাওয়ার পর মা একটু বিশ্রাম করবার জন্য শুতেন বটে, কিন্তু তখন আবার স্ত্রী-ভক্তেরা প্রায়ই আসতেন, কারণ তাঁদের অনেককেই বিকেল চারটা, সাড়ে চারটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হতো। এই সময়ে তিনি শুয়ে শুয়েই তাঁদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলতেন, কখনো বা কিছু পরেই উঠে পড়তেন। দুপুরের খাওয়া শেষ হতে দুটো বেজে যেত; বিশ্রাম করতেন বড়জোর এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা। সাড়ে তিনটা নাগাদ উঠে পড়তেন। তখন কাপড় কেচে, গা ধুয়ে এসে ঠাকুরের বিকালবেলার ভোগ দিতেন। সেই সময় অন্যান্য স্ত্রী-ভক্তেরা এসে জুটতেন। মা জপের মালাটি হাতে নিয়ে বসতেন। ঐ সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, বা কারো কোন প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিতেন।

পুরুষ ভক্তও অনেকে আসতেন বিকেলে। উদ্বোধনে মা আছেন, এই খবরটা জানাজানি হয়ে গেলেই পুরুষ-ভক্তরা তাঁকে দর্শন করবার বা তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলার দুর্লভ সুযোগ ছাড়তেন না। পুরুষ ভক্তদের জন্য সময় ঠিক করা থাকত—বিকেল সাড়ে পাঁচটা। তখন তাঁদের ওপরে ডাক পড়ত। মা চাদরে মাথা অবধি ঢেকে নিজের তক্তপোশের ওপর মেঝেতে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতেন। গরমের দিন হলে, তাঁকে বাতাস করতে হতো। একে একে সকলে প্রণাম করে যেতেন। ভক্তদের প্রশ্ন একটিই ছিল—মা, কেমন আছেন? তিনি সাধারণত ঘাড় নেড়ে উত্তর দিতেন। যদি তাঁদের অন্য প্রশ্নের কোন

উত্তর দিতে হতো, তাহলে খুব আস্তে কথা বলতেন, পাশে যে ব্রহ্মচারী বা সাধু দাঁড়িয়ে থাকত, তিনি মায়ের কথা স্পষ্ট করে বলতেন।

সন্ধ্যা হলে তিনি জপে বসতেন। জপ শেষ করে ভোগের আগে পর্যন্ত মেঝেয় বিশ্রাম করতেন। তখন কেউ তাঁর পায়ে বাতের তেল বা আমবাতের জন্য মরিচতেল মালিশ করে দিত। সাধারণত স্ত্রী-ভক্তেরা এ কাজটা করতেন। রাতে ঠাকুরের ভোগ শেষ হচ্ছে দশটা ও খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুতে এগারটা সাড়ে এগারটা বাজত। তাহলে দেখা যাচ্ছে হিসেবমত শ্রীমা রাতে ঘুমোতেন মাত্র তিন কি সাড়ে তিন ঘণ্টা।

মায়ের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও বৈচিত্র্য ছিল। যেমন, খুব বেশি মিষ্টি আমের চেয়ে টক টক মিষ্টিমিষ্টি আমই বেশি ভালবাসতেন। বোম্বাই থেকে এক ভক্ত পাঠাতেন আলফনসো আম; মা তা পছন্দ করতেন। পেয়ারাফুলি ও ছোট ল্যাংড়া আমও তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু কেউ ভক্তির সঙ্গে খুব টক আম দিলেও তা খুব খুশি মনেই খেতেন, যেমন একটি ছোট মেয়ে খেয়ে থাকে। তাঁর এই আম খাওয়ার একটা গল্প বলি। উদ্বোধনের বাড়িতে একদিন এক ভক্ত কতকগুলো আম কিনে আনেন। অগ্রভাগ খেতে নেই বলে, তিনি দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করে না চেখেই আমগুলো নিয়ে আসেন। দুপুরে ভোগের পর যখন সকলকে সেই আম-প্রসাদ দেওয়া হলো, টক বলে কেউই তা খেতে পারলেন না। কেউ বললে, লোকটা কি বোকা, না চেখেই আম কিনেছে। মা কিন্তু একটা আম খেয়ে বলেন, না, এ বেশ টক টক আম।

শাকের মধ্যে ছোলা শাক, মুলোশাক প্রভৃতি ভালবাসতেন। একবার দেশ থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগে খুব অরুচি নিয়ে আসেন। তখন তাঁকে এই ছোলাশাক খেতে দেওয়া হতো। শীতকালে মুড়ি, ফুট-কড়াই এবং উড়িয়ার দোকানের বেগুনি, ফুলুরি, ঝাল বড়া, আলুর চপ ইত্যাদি সকালের পূজায় ঠাকুরকে মাঝে মাঝে ভোগ দেওয়া হতো।

এইসব তেলেভাজা জিনিস মা পছন্দ করতেন। মুগের নাড়ু, ঝুরিভাজা ইত্যাদিও তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি রাতাবি সন্দেশ ও পিঠা-পুলিও ভালবাসতেন। রাঙা আলুর রসপুলি তৈরি করে ঠাকুরকে ভোগ দিতেন ও পরে ভক্তদের মধ্যে নিজের হাতে সেই উপাদেয় দ্রব্য পরিবেশন করে তৃপ্তি বোধ করতেন। শেষের দিকে আমরুল শাক মায়ের প্রিয় ছিল। তাঁর আমাশয়ের ধাত ছিল বলে কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন এই শাক ব্যবস্থা করেন। বেলুড় মঠ থেকে বাবুরাম মহারাজ মায়ের জন্য এই শাক পাঠিয়ে দিতেন। সকালে মা একটু মিছরির সরবৎ খেতেন।

বাতের অসুখটা তাঁর দক্ষিণেশ্বর থেকে হয়, সে কথা আগেই বলেছি। শেষের দিকে বাতটা ডান হাঁটুতে ছিল। সেজন্য দই খেতেন না, কখনো খেলেও নামমাত্র খেতেন। বাঁকুড়া জেলার মেয়ে বলে মায়ের দুটি জিনিস খুব প্রিয় ছিল—পাতলা কলাই ডাল আর পোস্ত পোড়া। পেটের অসুখ ও বাতের জন্য শেষের দিকে ডাক্তারের কথামত তিনি একটু করে আফিম খেতেন; সেজন্য দুপুরে ও রাতে আধসের করে দুধের ব্যবস্থা ছিল। দুপুরে তিনি দুধের অর্ধেক আন্দাজ খেতেন আর বাকী দুধে ভাত মেখে ভক্তদের জন্য প্রসাদ রেখে দিতেন। শরৎ মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তরা রোজ মায়ের কাছ থেকে অন্ন-প্রসাদ চাইতেন। বিকেলে পান ও জল ছাড়া বিশেষ কিছু খেতেন না। রাতে লুচি তরকারি ও দুধ দেওয়া হতো। লুচি দু'তিন খানার বেশি খেতেন না এবং দুধ প্রায় দেড় পোয়া খেতেন। তিনি দাঁতে রোজ চারবার করে গুল দিতেন। নারকেল পাতা ও দোক্তা পুড়িয়ে এটা তৈরি করা হতো।

জয়রামবাটিতে যখন থাকতেন তখন সেখানে মায়ের সঙ্গে মিশবার ও কথাবার্তা বলবার যে সুযোগ হতো, এমনটি আর কোথাও মিলত না। এখানে সকাল সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত বারান্দায় বসে তরকারি কুটতেন। ভক্তরা তখন তাঁর কাছে গিয়ে নানা কথাবার্তা বলতেন ও শাকসব্জির পাতা বাছতেন। এমন সস্নেহে প্রসন্ন মূর্তিতে মা এইসময়ে

কথাবার্তা বলতেন যে, যাঁরা একদিনও সেই সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাই জানেন। দেশের বাড়িতে ভক্ত-সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া, থাকা ইত্যাদির ব্যবস্থা মা নিজেই সযত্নে করতেন। ভক্তেরাও এখানে যেন আপন মায়ের স্নেহযত্ন অনুভব করতেন। জয়রামবাটিতে যখন থাকতেন, তখন সকাল ন'টার সময় স্নান করে এসে ঠাকুর পূজা করতেন। পূজা শেষ হলে ভক্তদের প্রসাদ দিতেন। সাধারণত মুড়ি, মিষ্টি ও হালুয়া তৈরি করিয়ে দিতেন কখনো বা ঐ সঙ্গে ফলমূল যা ওখানে পাওয়া যেত বা ভক্তেরা কলকাতা থেকে আনতেন, তাও থাকত।

জয়রামবাটিতে রান্নার কাজের জন্য একজন রাঁধুনী ছিল। কিন্তু ঠাকুরের ভোগটা মা নিজের হাতেই রান্না করতেন। তরকারিতে নুন, ঝাল ও মশলা সাধারণত একটু কমই দিতেন। সবাইকে বলতেন, তরকারিতে বেশি মশলা খাওয়া ঠিক নয়। রান্না হবে ছিমছাম, পরিষ্কার। ঐ অঞ্চলে গরীব ভক্তেরা কখনো কখনো মাকে দর্শন করতে আসতেন। কলকাতার ভক্তগণ মিষ্টি ইত্যাদি যা নিয়ে যেতেন, মা তা সযত্নে এইসব গরীব ভক্তদের জন্য রেখে দিতেন। জয়রামবাটিতে মা-কে সবাই দিদি ঠাকরুণ বলে ডাকত। অনেক বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ বাড়ির ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে একবার তাদের দিদি ঠাকরুণকে প্রণাম করতে প্রায় রোজই আসত। মাও যে জন্য যে এসেছে তা বুঝে তাদের হাত ভরে ফল, মিষ্টি প্রভৃতি যা থাকত প্রসাদ দিতেন। আবার দেশের সিংহবাহিনী ও ধর্মঠাকুরের সেবার জন্যেও ফল ও মিষ্টি পাঠিয়ে দিতেন; আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের দিতেন। যেন অন্নপূর্ণা। সকলেই ধন্য ধন্য করত।

একদিনের একটা ঘটনা বলি। তখন শীতকাল, পৌষমাস রাঁধুনির সাহায্যে অনেক পুলিপিঠে তৈরি করলেন মা। ছুটি পেলেই বাঁকুড়া থেকে তাঁর এক শিষ্য প্রায়ই জয়রামবাটি এসে থাকেন, তাই মা তাঁর জন্য কিছু পিঠা-পুলি রেখে দিয়েছেন। দু'দিন গেল, কিন্তু শিষ্যটি আর আসছে না। তবু মা রোজ ঐ পিঠে-পুলি আবার ভেজে রেখে

দিলেন। ভাবছেন, কাল হয়ত আসতে পারে ; যদি আসে, মনে হবে, আহা খেতে পেলে না। এই ভাবে চারদিন রাখবার পর শিষ্যটি গিয়ে সেই পিঠাপুলি খেয়েছিলেন।

আর একবার আর এক শিষ্যের জয়রামবাটি থাকতে তার খুব পাঁচড়া হয়েছিল। নিজে হাতে খেতে পারতেন না। এই সময় মা নিজে ভাত মেখে তাঁকে খাইয়ে দিতেন ও তাঁর উচ্ছিষ্ট পাতা পর্যন্ত ফেলতেন। মাতৃহৃদয়ের এই যে অপার স্নেহ এর কোন তুলনা আছে ? তবে মা অন্তরে সকলকেই এই রকম স্নেহ করলেও বাইরে সব রকম ব্যবহারেই গাম্ভীর্য, সংকোচ ও লজ্জাশীলতা রক্ষা করে চলতেন। এই গুণেই তো তিনি সকলের অন্তরে পরম শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন।

দূর দেশ থেকে যেসব ভক্ত জয়রামবাটিতে মাকে দেখতে আসতেন তিনি তাদেরকে প্রায়ই দুই-একদিন বিশ্রাম করতে বলতেন। যদি কেউ মায়ের অসুবিধার কথা ভেবে ফিরে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি করতো, তিনি ছাড়তেন না। বলতেন, তোমরা কত কষ্ট করে এখানে এসেছ। গয়া, কাশী যাওয়া বরং সহজ, এখানে আসা তার চেয়েও কষ্টকর। দু'দিন থেকে গেলে আমার কোন অসুবিধাই হবে না।

শ্রীমা সকলদিক দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য লীলাসঙ্গিনী ছিলেন এবং ঠাকুর যে তাঁকে তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি মনে করতেন, তা মায়ের প্রকৃতিগত অনেকগুণ থেকেই জানা যেত ! ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসাবে প্রার্থীকে দীক্ষা বা মন্ত্র দেওয়া তাঁর একটা প্রধান কাজ ছিল। এ কাজ ছিল মায়ের কাছে ঠিক ব্রতাচরণের তুল্য। এর দুটো দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি।

মা তখন কলকাতায়। দেশ থেকে ম্যালেরিয়ায় একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে ফিরেছেন। চিকিৎসায় জ্বর থেমেছে মাত্র, কিন্তু খুব দুর্বল। ভক্তদের কাউকে সেজন্য দর্শন করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই সময়

বোম্বাই থেকে একটি পার্শী যুবক তাঁকে দর্শন করতে এলো। অতদূর থেকে এসেছে আর অন্য ধর্মের লোক, এ মনে করেই বোধ হয় শরৎ মহারাজ তাকে দর্শন করতে অনুমতি দিলেন। যুবকটি মাকে প্রণাম করে, দীক্ষা প্রার্থনা করল। কাছেই ছিলেন মায়ের সেবক, ব্রহ্মচারী অরূপানন্দ। তাকে মা শুধোলেন, দেবো? দিই দিয়ে। সেবকটি বলেন, তা কি হয়, আপনি সবে অসুখ থেকে উঠেছেন। মা শুনলেন না নিষেধ। দীক্ষা দিয়ে দিলেন। বললেন, এতো ঠাকুরের কাজ, তিনিই তো পাঠাছেন।

অনেক সময় মা অল্প বয়সের ছেলেদেরও দীক্ষা দিয়েছেন। একবার উদ্বোধনে একটি ছেলে, বছর বারো বয়স হবে, বিকেলে ভক্তদের সঙ্গে মাকে প্রণাম করার পর কাঁদতে থাকে। তার সে কান্না আর থামে না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলল, মায়ের কৃপা চাই। সবাই বুঝলেন ছেলেটি মন্ত্র চায়। কিন্তু অত ছোট ছেলে মন্ত্রের কি বোঝে? পরের দিন দেখা গেল সেই ছেলেটি বাইরের রোয়াকে একা বসে আছে। উদ্বোধনের সাধুরা জিজ্ঞাসা করেন তার বসে থাকার কারণ। তার সেই একই উত্তর, মায়ের কাছে মন্ত্র চায়। ঠিক সেই সময় দেখা গেল মা রাধুকে দিয়ে ছেলেটিকে ভেতরে ডাকালেন। কিছুক্ষণ পরে সবাই দেখলেন ছেলেটি বেশ হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে সে আনন্দে উত্তর দিল, আমার দীক্ষা হয়েছে। শুনে সবাই তো অবাক। একজন সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, মা,অতটুকু ছেলেকে আবার কি দীক্ষা দিলেন? ও কি বোঝে?

—তা যা হোক, বাপু, ছেলেমানুষ।

—হলেই বা ছেলেমানুষ, তবু—

—দেখলে না কাল কি রকম পায়ে পড়ে কাঁদলে। কে ভগবানের জন্যে কাঁদছে বলো দেখি? এ মতি কজনের হয়?

এই দীক্ষাদানের প্রসঙ্গে শ্রীমা'র স্বভাবের আর একটি দিকের কথা বলতে হয়। তিনি ছিলেন নম্রতার প্রতিমূর্তি। এতলোক যে

তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে কৃতার্থ বোধ করত, তবু তিনি নিজেকে সব সময়ে ঠাকুরের একজন কৃপাপ্রাপ্তা চরণাশ্রিতা বলেই মনে করতেন। যখন কাউকে দীক্ষা দিতেন তখন ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বলতেন, ঐ উনিই গুরু। আসল কথা তাঁর মনের ভাবটা এই ছিল যে, তাঁর যা কিছু সবই ঠাকুর। ঠাকুরের বাইরে তাঁর যে অস্তিত্ব আছে, এ যেন মা কল্পনাই করতে পারতেন না। একবার তাঁর শেষ অসুখের সময় একজন বর্ষীয়সী স্ত্রী-ভক্ত মাকে যেই 'জগদম্বা' বলে প্রশংসা করেছেন অমনি তিনি আপত্তি করে বলে উঠলেন, কিসের জগদম্বা? তিনি দয়া করে পায়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে বর্তে গেছি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে ও সাধনায় যত মত তত পথের সমন্বয় করেছিলেন। সকল ধর্মে সকল মতের ভেতর দিয়ে সাধনা করে তিনি এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে, ভগবান বিশ্বপিতা, তাঁর জাতের বিচার নেই। সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি সমান চক্ষে দেখেন। তাই তো ঠাকুর বলতেন, আল্লা মানে যা, God মানে ত তাই; পানি আর জল--একই কথা। যুগদেবতার জীবনের এই সত্যকে শ্রীমা তাঁর জীবনে কি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তারই একটা ঘটনা বলি।

জয়রামবাটির কাছে শিরোমণিপুরে অনেক মুসলমানের বাস তারা আগে তুঁতের (রেশমকীটের) চাষ করত। বিদেশী রেশমের প্রতিযোগিতায় তাদের ঐ ব্যবসায় ক্রমশ নষ্ট হওয়ায় শেষে চুরি ডাকাতিই তাদের জীবিকা হয়ে দাঁড়ায়। পাশের গ্রামের লোকেরা এই তুঁতে ডাকাতদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। যদি কোন দিন দেখা গেল যে একটা তুঁতে কোন একটা গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলেছ, তাহলে গাঁয়ের লোকেরা মনে করত শীঘ্রই গ্রামে ডাকাতি হবে। তখন জয়রামবাটিতে তাঁর নিজের বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। এই বাড়ি শরৎ মহারাজের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়। সে বছর ঐ অঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেজন্য ঐ বাড়ি তৈরির কাজে অনেক তুঁতে মজুর নিযুক্ত

হয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা প্রথমটায় ভয় পেলেও শেষে বলত, মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্যন্ত ভক্ত হয়ে গেল রে। একদিন মা একটি তুঁতে মুসলমানকে বাড়ির ভেতরে তাঁর নিজের ঘরের বারান্দায় খেতে দিয়েছেন। তাঁর ভাইঝি নলিনী উঠোনে দাঁড়িয়ে তাকে দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পরিবেশন করছিল। শ্রীমা তা দেখে বলে উঠলেন, অমন করে দিলে মানুষের কি খেয়ে আরাম হয়? তুই না পারিস আমি দিচ্ছি। খাওয়ার শেষে মা নিজের হাতে সেই উচ্ছিষ্ট স্থানটি ধুয়ে মুছে দিলেন।

—ও পিসিমা, তোমার জাত গেল।

—আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।

এই তো সারদাদেবীর উপযুক্ত কথা। তিনি যে জগতের মা- সেই সত্যটা এমনি করে বুঝিয়ে দিলেন।

আর একদিন। তুঁতে মুসলমান এক ছড়া পাকা কলা এনে বললে, মা, ঠাকুরের জন্য এগুলো এনেছি, নেবেন কি? মা নেবার জন্য হাত পাতলেন; বললেন, খুব নেব, বাবা দাও, ঠাকুরের নাম করে এনেছ, নেব বইকি। পাশেই ছিলেন একজন স্ত্রীভক্ত। তিনি বললেন, ওরা চোর আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন? মা একথার কোন উত্তর না দিয়ে মুসলমানটিকে কিছু মুড়ি মিষ্টি দিতে বললেন। সে চলে গেলে তিনি ঐ ভক্তটিকে তিরস্কার করে গম্ভীর ভাবে বললেন, কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।

তাঁর মাতৃসুলভ স্নেহ ও ক্ষমার অনেক গল্প আছে একবার এক তরুণ ভক্ত অন্যায় আচরণ করে। তখন ঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমাকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন অন্যায়কারী ঐ যুবক ভক্তটিকে তাঁর কাছে আসতে না দেন। তাতে মা বলেছিলেন, আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে নিতে হবে।

তেমনি মায়ের সহনশীলতার সীমা ছিল না। কত লোক কতরকম পাপতাপের বোঝা নিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করত। তখন শরীরে ভীষণ

জ্বালা অনুভব করলেও মা নীরবে সহ্য করতেন। একদিন বিকেলে দর্শনার্থীদের প্রণামের পর দেখা গেল, তিনি বারান্দায় এসে হাঁটু অবধি পা অনবরত ঠাণ্ডা জলে ধুচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করায় বললেন, ভবিষ্যতে আর কাউকে আমার পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করতে দিও না। যত পাপ এসে ঢোকে, আমার পা জ্বলে যায় ; পা ধুয়ে ফেলতে হয়। এইজন্যই ত এত অসুখ। দূর থেকে প্রণাম করতে বলব। ঠাকুরকে কি কম লোকের পাপের বোঝা নিতে হয়েছিল। তাইতো অমন সোনার বরণ বলিষ্ঠ শরীর রোগে ভুগে কিরকম শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। দেখলে কষ্ট হতো। কত বারণ করতাম। শুনতেন না ; হেসে বলতেন নিজে একদিন বুঝবে।

এইজন্যেই তো তাঁদের আসা, পাপীতাপীদের বোঝা যদি না বইবেন তবে যুগে যুগে তাঁর আসেন শুধু কি সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্ট লোকদের বিনাশ করতে ?

ছোট ছোট ঘটনায় মানুষকে চেনা যায়। তেমনি ছোট ছোট খুঁটিনাটি কাজেও শ্রীমায়ের আচরণ ছিল আদর্শস্থানীয়। তাঁর একজন সেবক লিখেছেন—'উদ্বোধনে আমরা স্নানের পর কাপড় শুকোতে দিতাম বিকেলে বর্ষা হলে সেগুলো ভাল করে শুকাত না। কোনখানা হয়ত আবার ভিজত, কোন খানার জন্য হয়ত ভাল করে নিংড়ান হত না। দেখতাম, মা আস্তে আস্তে সেই কাপড়গুলো আবার নিংড়িয়ে দোতলার দক্ষিণের ঘরে লম্বা করে দড়িতে বা জানালায় গরাদের সঙ্গে বেঁধে শুকাতে দিয়েছেন। একদিন বৃষ্টির পরে তাঁকে ঐ রকম করতে দেখে আমি বললাম, মা, এত লোক রয়েছে, আপনি আবার কেন জল ঘাঁটছেন ? বৃষ্টিতে বারান্দা সব ভিজে গেছে, পায়ে বাত—আর কি লোক নেই ? মা বললেন, না, বাবা, এই যাচ্ছি, সামান্য একটু।'

এই সামান্য ঘটনার মধ্যেই আভাসিত হয়েছে সঙ্ঘ-জননীর চরিত্রের অসামান্যতা। ঠাকুরের ওপর স্বাভাবিক ভাবেই মায়ের দাবি সকলের

চেয়ে বেশি ছিল। তবু ভাবলে আশ্চর্য মনে হয়; এই মহীয়সী শক্তিময়ী নারী সব সময় নিজেকে মনে করতেন অন্যের মতো তিনিও ঠাকুরের আশ্রিত ও তাঁর কৃপা-প্রার্থীদের একজন। এই অসাধারণত্ব হৃদয় দিয়ে অনুভব করার জিনিস, যুক্তি দিয়ে বোঝাবার নয়।

ত্যাগী ও গৃহী শ্রীমা'র কাছে সমান আদর পেয়েছে। তবু দেখা যেত ত্যাগীরা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। বলতেন, বাবা, এদের না হলে কাদের নিয়ে থাকব? একবার বেলুড়মঠে ঠাকুরের উৎসবে মা গিয়েছেন। দুপুর বেলা তাঁর আহারের পর সাদা কাপড়-পরা একজন ব্রহ্মচারী ঘটি থেকে জল ঢেলে দিচ্ছেন, মা দাঁড়িয়ে আঁচাচ্ছেন। আঁচাবার পর তিনি পা ধুতেন। ব্রহ্মচারিটি সেইজন্য পায়ে জল ঢেলে দিয়ে, হাঁটুর বাতের জন্য মায়ের নীচু হতে কষ্ট হবে মনে করে নিজেই হাত দিয়ে পায়ের পাতার ওপরের জলটা একটু মুছিয়ে দিচ্ছেন। অমনি তিনি খুব সংকোচের সঙ্গে বল্লেন, না, না, বাবা, তুমি! তোমরা দেবের আরাধ্য ধন। এই বলে নিজেই হাত দিয়ে পা মুছলেন। ঠাকুরের আদর্শ তিনি এমনি করেই রক্ষা করতেন।

আট

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গান-পাগল মানুষ। তিনি যেমন গান শুনতে ভালবাসতেন, নিজেও তেমনি গাইতে পারতেন। কিন্নর-কণ্ঠ গায়ক ছিলেন তিনি। রামপ্রসাদী গান তাঁর কণ্ঠে নতুন রূপ নিয়েছিল। বলতে গেলে গান গেয়েই তো তিনি জগদম্বাকে পেয়েছিলেন। মন্দিরে পূজায় বসতেন যখন, তখন হাতের ফুল হাতেই রয়ে যেত, ভবতারিণীর শ্রীমুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি গান গাইতেন তন্ময় হয়ে। বিবেকানন্দ যখন নরেন দত্ত ছিলেন, তখন কলকাতায় সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠে গান শুনে ঠাকুর তাঁর ভাবী মানস-সন্তানের প্রতি অমন ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

ঠাকুরের মত শ্রীমাও গান ভালবাসতেন। তিনি নিজে গাইতেন না (যদিও মাঝে মাঝে গুণ গুণ করে আপন মনে গাইতেন), তবে গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশবাবুর থিয়েটারে গিয়ে চৈতন্যলীলা নাটকে অভিনেত্রী বিনোদিনীর গান শুনে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। শ্রীমা'র সময় দু'জন নাম-করা অভিনেত্রী ছিল— তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী। দু'জনেই থিয়েটারে অভিনয় করত। মাঝে

মাঝে মায়ের কাছে এসে তাঁর করুণা লাভ করে কৃতার্থ হয়ে চলে যেত। মা নিজের হাতে তাদের প্রসাদ দিতেন। তারা ঘরের বাইরে চলে যেত। খাওয়া হয়ে গেলে নিজের হাতে পাতা তুলে বাইরে ফেলে দিত। তারপর গোবর-জল ছিটিয়ে এঁটো জায়গাটা পরিষ্কার করে নিকিয়ে নিত। তাদের এই ভাবটা মায়ের খুব ভাল লাগত। বলতেন, ঠাকুর নটী বিনোদিনীকে কৃপা করেছিলেন ; এরা আমার কাছে আসে সেই আশায়।

একদিন তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী এসেছে মায়ের কাছে। সেখানে বসেছিল কয়েকজন ভক্ত। তারা তিনকড়িকে দেখেই চিনতে পারল। তখন তারা মাকে বলল, ওঁকে বলুন না, মা, আমাদের গান শোনাতে। ভক্তদের অনুরোধে শ্রীমা আদেশ করলেন তিনকড়িকে, একটা গান গাও তো! ওরা শুনতে চাইছে।

মায়ের আদেশ পেয়ে মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান ধরলে তিনকড়ি। গান শোনামাত্র সারদাদেবীর সমাধি হয়। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয় তাঁর। পরে, জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনকড়িকে বলেন, কি গানই শোনালি রে! ঠাকুর তোমাদের কৃপা করবেন। এই অভিনেত্রীটির গান তখনকার দিনে সকলকেই মোহিত করত। ওরা চলে গেলে শ্রীমা একজন ভক্তকে বললেন। এদেরই ঠিক ঠিক ভক্তি। যেটুকু সময় ভগবানকে ডাকে সেটুকু একমনে ডাকে।

সেদিন ভক্তির প্রসঙ্গে মা তাঁর ভক্তদের বললেন—ঠাকুরের জীবনে তোমরা দেখেছ তিনি ভক্তিকেই আগে স্থান দিতেন। মা জগদম্বাকে তো তিনি ভক্তির জোরেই লাভ করেছিলেন। সকল মন্ত্র-তন্ত্রের তুলনায় ভক্তি বড়। সকল ফুলের চেয়ে ভক্তিই তাঁর অর্চনার শ্রেষ্ঠ ফুল। তোমরা তো মহাভারত পড়েছ। সেখানে দেখেছ অর্জুন শুধু ভক্তির বলে শ্রীকৃষ্ণকে তার বন্ধুরূপে লাভ করেছিল। গীতায় আছে, ভক্তই তাঁর সব চেয়ে প্রিয়। তাঁর যে ভক্ত হয়, তার কখনো বিনাশ হয় না।

ভক্তিতত্ত্বের মতো এমন একটা কঠিন বিষয় শ্রীমা এত সহজ করে অল্প কথায় সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যা শুনে সকলেই মুগ্ধ হলো, বিস্মিত হলো। তাদের ধারণা শ্রীমা'র মুখ দিয়ে স্বয়ং যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণই বুঝি কথা বলছেন। এক-আধ বছর নয়, তেত্রিশটা বছর সঙ্ঘ জননী এই ভাবেই জ্ঞানের কথা, ধর্মের কথা পরিবেশন করে সংসারী মানুষকে কৃতার্থ করেছেন ঠিক যেমনটি করতেন তাঁর জীবন-দেবতা। দক্ষিণেশ্বরে দিব্যজ্ঞানের যে অমৃত নির্ঝর রামকৃষ্ণ কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হতো, সেই অমৃতসমান কথা উদ্বোধন, বলরাম মন্দির ও জয়রামবাটিতেও শোনা যেত শ্রীমায়ের মুখে তেমনি সহজভাবে, সুন্দর ভাবে। যুগদেবতার অসমাপ্ত কাজ তিনি এইভাবে তেত্রিশ বছর ধরে সম্পন্ন করেছেন ক্লান্তিহীন ভাবে। তাঁর মহত্ত্ব এইখানেই।

একদিন দুপুরের কিছু পরে একটি মেয়ে-ভক্ত এলো উদ্বোধনে। মা তখন একা বসে ছিলেন। একজন ব্রহ্মচারী তাঁকে 'ভারতে বিবেকানন্দ' ও 'কথামৃত' পাঠ করে শোনাচ্ছিল। তাঁর নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল এইসব বই-এর কথা শোনা। এজন্য শরৎ মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে বিশেষ-ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর কাজ ছিল মাকে ঠাকুরের ও স্বামীজির বই পড়ে শোনানো। যখন যেখানেই থাকতেন, একজন না একজনকে দিয়ে তিনি এই সব বই পড়িয়ে শুনতেন। কথামৃত শুনে শুনে ঠাকুরের সব বাণী তাঁর যেন কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

মেয়ে-ভক্তটি আসতেই কিছুক্ষণের জন্যে পাঠ বন্ধ হয়। ব্রহ্মচারীটি সেখান থেকে উঠে গেলে, শ্রীমা ভক্তটির কুশল জিজ্ঞাসা করে বসতে বললেন। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন সে যেন বিষাদের প্রতিমা। করুণা মাখানো স্বরে জিজ্ঞাসা করেন মা, তোমার দুঃখ কি?

—জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছি, মা। আর সহ্য করতে পারছি না। তাই আপনার কাছে এসেছি যদি আপনি একটু কৃপা করেন।

—কৃপা করার মালিক ভগবান। তাঁকে ডাকো।

—আপনি আমাকে কৃপা করুন। আমি দুঃখ সইতে সইতে মরে গেলাম। আর আমি দুঃখ সইতে পারছি না।

—ছাখো মা, সংসারে সবাই দুঃখ দুঃখ বলে কাঁদে। কিন্তু দুঃখই তো ভগবানের দয়া। সংসারে সবাই দুঃখ পেয়েছে। দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়েই তো আমাদের মন খাঁটি সোনা হয়। দুঃখকে ভগবানের দান বলে মনে করো।

শ্রীমা'র কথা শুনে মেয়েটি বেশ সান্ত্বনা পেল। অশান্তিভরা হৃদয় নিয়ে এসেছিল, ফিরে গেল বুকভরা শান্তি নিয়ে।

একদিন।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা হবে। এক গৃহস্থ শিষ্য মাকে প্রণাম করতে এসেছেন। প্রণাম করে বলেন, মা, কেন ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে না?

—ডাকতে থাক, ক্রমে হবে। কত মুনি ঋষি যুগযুগান্তর ধরে তপস্যা করে পেলে না, আর তোমাদের ফস্ করে হবে?

—ডাকতে তো কসুর করি না, মা।

—তবে আর ভাবনা কি? এ জন্মে না হয়, পর জন্মে হবে, পর জন্মে না হয়, তার পরজন্মে হবে। ভগবান লাভ কি এতই সোজা?

—একজন আমাকে বললে, শ্রীরামকৃষ্ণ যে পথ দেখিয়ে গেছেন সেই পথই নাকি সোজা?

—যদি বিশ্বাস করো, তাই। আসল কথা কি জানো, বাবা, শুদ্ধ মন না হলে দর্শন হয় না। এই ছাখো অনেকে ঠিক মতো জপধ্যানই করে না। অন্যের কথা থাক, আমার নিজের কথাই বলি। ঠাকুর আমাকে বলে দিয়েছিলেন, আলস্য ত্যাগ করে ঠিক সময়ে জপধ্যান করতে। করতামও তাই। দক্ষিণেশ্বরে একদিন শরীরটা খারাপ লাগায় একটু দেরিতে উঠেছি। তখন রাত তিনটায় উঠতাম। পরের দিন আরো দেরিতে উঠলাম। ক্রমে দেখি আর সকালে উঠতেই ইচ্ছা যাচ্ছে না। তখন মনে হলো, ওরে এই তো আলিস্যিতে

পেয়েছে। তারপর জোর করে উঠতে লাগলাম, তখন সব আগের মতো হতে লাগল।

মায়ের এই সরল কথায় শিষ্যটির মন শান্ত হলো। রামকৃষ্ণ মুখী মন ছিল তাঁর; তাই তো শ্রীমা জ্ঞানের কথা এমন সহজ ভাবে বলতে পারতেন।

একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় শ্রীমা কলকাতা থেকে জয়রামবাটি আসবার পথে সকালে কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌঁছুলেন। প্রতি বছর তিনি বাপের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা করতেন। কোয়ালপাড়া আশ্রমে তখন খুব স্বদেশী চর্চা হয়। ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ যত না হয় তার চেয়ে তাঁত ও চরকার উপরই সকলের বেশি ঝোঁক। আশ্রমের ভক্তদের বললেন, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য ঘর ও আমাদের পথের বিশ্রামের স্থান একটু করেছ, তখন এবার কলকাতা ফিরবার সময় ঠাকুরকে এখানে বসিয়ে দিয়ে যাব। সব আয়োজন করে রেখো। পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করবে। শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর। তিনিই আদর্শ, যা কিছু করো না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।

একজন বললেন, স্বামীজি তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না দেশের হতো।

এই কথা শুনে সারদাদেবী বললেন, ও বাবা, নরেন, আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আর তাকে ছেড়ে দিত। জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উঠলে শ্রীমা যেন পঞ্চমুখ হয়ে যেতেন। একটু চুপ করে তারপর বললেন, বিলেত থেকে ফিরে এসে নরেন আমাকে বললে, মা, আপনার আশীর্বাদে এযুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরি জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি। সেখানেও দেখলাম

ঠাকুরের কি মহিমা। কত সজ্জন লোক আমার কাছে তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছে। আমি তখন নরেনকে বললাম, ঠাকুর তোমাকে এই কাজের জন্যেই তো রেখে গেছেন। শুনে নরেন বললে, সে কথা ঠিক; কিন্তু তোমার আশীর্বাদেই তো গিরি লঙ্ঘন করলাম।

শ্রীমা'র অন্তরে ঠাকুরের আদর্শ যেমন অবিচল ছিল, তেমনি বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্য তাঁর হৃদয়ে ছিল অসীম স্নেহ। তাঁর দ্বারা দেশবিদেশে ঠাকুরের মহিমা কিভাবে প্রচারিত হয়েছে, সে কথা শ্রীমা যেন হাজার বার বলেও তৃপ্তি পেতেন না।

কলকাতা যাবার পথে মা কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন। নিজের হাতে ঠাকুরের ও নিজের ফটো দু'খানা বসিয়ে বিশেষ পূজা করলেন এবং একজনকে দিয়ে হোম করালেন। উত্তরকালে শ্রীমা বলতেন, কোয়ালপাড়া আমার বৈঠকখানা। এই প্রসঙ্গে তাঁর পল্লীপ্রীতির কথা বলতে হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি জয়রামবাটি এসে একটু স্বাধীনভাবে চলফেরা করতে পারি। কলকাতা থেকে এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। সেখানে তো আমাকে খাঁচার ভেতর পুরে রাখা হয়। আমাকে সব সময় সংকুচিত হয়ে থাকতে হয়। কলকাতায় সব সময় হিসেব করে কথা বলতে হয়, চলতে হয়। কে কোন্ কথাটিতে অসন্তুষ্ট হবে! তার চেয়ে দেশে আমি থাকি ভাল। আমি তাদের হড় হড় করে যা মুখে এল দু-কথা বলে গেলুম। তারাও আমাকে যাহোক দু'কথা বলে গেল। তারাও কিছু মনে করলে না, আমিও কিছু মনে করলুম না, ব্যাস। আর কলকাতার লোকেরা কথার একটু এদিক ওদিক হলেই ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল। স্বল্প কথায় গ্রামীণ সভ্যতা ও শহুরে সভ্যতা সম্পর্কে শ্রীমায়ের এই যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, এর কোন তুলনা আছে?

সংসারে যাঁরা মহত্ত্বের গৌরবটীকা ললাটে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে এমন কতকগুলি দুর্লভ গুণের সমাবেশ দেখা যায় যা

সচরাচর আমরা অন্যের মধ্যে দেখতে পাই না। সারদাদেবী ছিলেন এরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাজ ছাড়া তিনি একটি মুহূর্ত থাকতেন না—তা সে সাংসারিক কাজ হোক বা আধ্যাত্মিক কাজ হোক। কাজ অনেকে করে এবং প্রথম প্রথম উৎসাহ যে রকম থাকে. ক্রমে তাতে ভাঁটা পড়তে থাকে। শ্রীমায়ের জীবন ছিল এর ব্যতিক্রম। তিনি সারাজীবন দৈনিক কাজগুলি সমান উৎসাহ ও প্রীতির সঙ্গে সম্পন্ন করে গেছেন—এজন্য তাঁর কোন ক্লান্তি বা শ্রান্তি ছিল না।

জয়রামবাটিতে রোজকার সেই রান্নাবাড়া, খাওয়ান ইত্যাদি একঘেয়ে কাজ, তার ওপর যখন তখন ভক্তদের আসা-যাওয়া আবার তাঁর সংসারের এক একজন এক এক রকমের ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি এই সব কাজ আনন্দের সঙ্গে করে যেতেন। যেন তাঁরই সকল দায়িত্ব, বাড়ির আর সকলে অভ্যাগত! জয়রামবাটিতে দেখা যেত, সকালবেলা সেই ঘণ্টা দুই ধরে শাক তরকারি কুটা, রান্নার জন্য বের করে দেওয়া, পূজার সব যোগাড় করে নিজে পূজা করা, আবার দীক্ষাদান, প্রসাদ ও জল খাবার বেঁটে দেওয়া, কমপক্ষে একশ খিলি পান সাজা, ভক্তগণকে ও বাড়ির লোকজনকে খাওয়ান, বিকেলে নিজের হাতে লুচি রুটি তরকারি প্রভৃতি করা, দুধ জ্বাল দেওয়া, লণ্ঠন পরিষ্কার করা--এই ছিল তাঁর রোজকার কাজের ফর্দ। আর এই সব কাজ প্রত্যহ তিনি আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। শরীরের দিকে লক্ষ্য থাকত না--কাজের দিকেই মন থাকত। যদি কেউ বলত, মা, আপনার বয়স হচ্ছে, শরীর পড়ে যাচ্ছে, এখন কাজের মাত্রা একটু কমিয়ে দিন, তিনি হেসে উত্তর দিতেন, রাশ টেনে আছি, তাই সুশৃঙ্খলে সব হয়ে যাচ্ছে ; একটু আলগা দিই, অমনি সব ছত্রাকার হয়ে যাবে।

এতো গেল তাঁর স্বভাবের এক দিক। অন্য দিকে দেখি ছোট খাটো বিষয়েও সারদাদেবীর অদ্ভুত দৃষ্টি ছিল। জয়রামবাটিতে তাঁর নতুন বাড়ি হওয়ার পর গ্রাম্য পঞ্চায়েত চার টাকা খাজনা ধার্য করে

জ্ঞানানন্দের কাছ থেকে তা আদায় করে। ইনি তখন ওখানে মায়ের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। মা তখন কলকাতায় ছিলেন। পরের বছর মা দেশে গেলে চৌকিদার যখন খাজনা আদায় করতে এলো তখন মা বললেন, এত বেশি কেন? কমাবার চেষ্টা কর। আমি না হয় দিলাম। কিন্তু আমি যখন থাকব না তখন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যে থাকবে সে কি করে দেবে? তার খাওয়া পরাই হয়ত ভিক্ষা করে চালাতে হবে।

আর একবার স্বামী জ্ঞানানন্দ যখন জয়রামবাটিতে, তখন সে গোয়ালাকে খাঁটি দুধ দেবার জন্য বিশেষ করে বলত, টাকায় আট সের দেবে, তবু খাঁটি চাই। এইভাবে সে চড়া দরে দুধ কিনত। একদিন মা এই ব্যাপারটা শুনতে পেয়ে তাকে বকলেন। বললেন, ওকি, জ্ঞান, এখানে পয়সায় পোয়া দুধ মেলে, গরীবে খেতে পায়। আর তুমি অমনি করে দর বাড়াচ্ছ! গোয়ালা--সে তো জল দেবেই দর বাড়ালে তখন তো পয়সা বেশি পাবে বলে আরো জল মেশাতে চাইবে।

একদিন তাঁর বিয়ের কথা নিয়ে একজন মেয়ে-ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ঠাকুরের সঙ্গে আপনার বিয়ে হওয়াতে আপনার মা সুখী হয়েছিলেন? উত্তরে শ্রীমা ভক্তটিকে সরল মনে বললেন না। মা দুঃখ করতেন, এমন পাগল জামাইয়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলাম, আহা! ঘর-সংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হলো না, মা বলাও শুনলে না। একদিন ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে বলছেন, শাশুড়ী ঠাকরুণ, সে জন্য আপনি দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে। তা যা বলে গেছেন তা ঠিক হয়েছে মা।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ যখনি হতো, তাঁর লীলাসঙ্গিনী রূপে শ্রীমার সমস্ত অন্তর যেন তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠত। ঠাকুরের কথা বলতে ও

শুনতে তাঁর এমন আনন্দ হতো যে সংসারের অন্য কোন প্রসঙ্গে তিনি যে রকম আনন্দ বোধ করতেন না। এর থেকেই বোঝা যায় তাঁর অস্তিত্বের কেন্দ্রে ছিলেন তাঁর পতিদেবতা। একবার এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন মাকে, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি তাঁর দর্শন পেয়েছেন কিনা। উত্তরে শ্রীমা বলেন, যখন তিনি চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হলো আমিও চলে যাই। অমনি তিনি দেখা দিয়ে বললেন, না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকী আছে। শেষে দেখলাম তাই তো অনেক কাজ বাকী। ঠাকুর বলতেন, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখবে। আমাকে তিনি নিজে বলে গিয়েছেন যে, তিনি একশো বছর সূক্ষ্মশরীরে ভক্তহৃদয়ে বাস করবেন আর তাঁর অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবেন।

একদিন এক স্ত্রী-ভক্ত কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মা, ঠাকুর যখন চলে গেলেন তখন একা একা আপনার কি রকম মনে হতো ?

—প্রথম প্রথম ভয় হতো। পরনে লাল কাপড় (সরু লাল পেড়ে কাপড়), হাতে বালা—লোকে কি বলবে ? বয়সটাও তখন কম। কামারপুকুরে রয়েছি তখন। তারপর ঠাকুরের দেখা পেতে লাগলাম। তখন সে সব ভয় ক্রমে দূর হলো। একদিন ঠাকুর এসে বললেন, খিচুড়ি খাওয়াও। খিচুড়ি বেঁধে ওঁদের গৃহবিগ্রহ রঘুবীরকে ভোগ দিলাম।

—তা এত খাবার জিনিস থাকতে খিচুড়ি ভোগ কেন ?

—রঘুবীর খোট্টা কিনা, তাই খিচুড়ি। তারপর বসে ভাবে ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগলাম।

একদিন এক শিষ্য হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মা, আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখেন ?

—সন্তানের মতো দেখি।

—মা, আমি তো ঠাকুরকে দেখিনি।

—ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান।

—ঠাকুর যদি ভগবান, তবে আপনি কে?

—আমি আবার কে?

নিজের স্বরূপ সারাদাদেবী এমনি করেই লুকিয়ে রাখতেন। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে বিশ্বজননীরূপে পূজা করে পায় অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন সেই শক্তিময়ী নারী তাঁর স্বামীর আদর্শের মধ্যে নিজেকে এমন ভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিজেকে তিনি কোনদিনই কারো কাছে জাহির করতে যার পর নাই সংকোচ বোধ করতেন। রামকৃষ্ণময় ছিল তাঁর জগৎ। যখনি কেউ তাঁকে প্রণাম করে সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করত, তখন শ্রীমা সুপ্রসন্ন ভাবে বলতেন, হ্যাঁ বাবা, সকলের মঙ্গলের জন্য আমি সর্বদা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি। সকলকেই বলতেন, তোমরা সকলে কায়মনো প্রাণে ঠাকুরের পায়ে স্মরণ লও, কল্যাণ হবে। আমি কিছু না, ঠাকুরই সব। এমন কথা যিনি বলতে পারেন তাঁর মহত্ত্ব কি কম!

নয়

১৩২৬। পৌষ মাস।

শ্রীমা জয়রামবাটিতে ছিলেন। জন্মতিথির দিন বিকেলে তাঁর সামান্য জ্বর হলো। মাঝে মাঝে ভাল থাকলেও এই জ্বরে ক্রমশঃ ভুগে ভুগে তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। শারীরিক এই অসুস্থতার মধ্যেও ভাবলে আশ্চর্য লাগে, অনেক ভক্ত সেখানে দীক্ষা নিতে গিয়েছেন এবং তাঁর কৃপালাভ করেছেন। হয়ত একবার জ্বর হয়ে গেল ; জ্বর ছাড়তেই—অন্নপথ্য পাওয়ার আগেও মা দীক্ষা দিয়েছেন। তখন যদি কেউ তাঁর শরীরের দুর্বলতার কথা তুলত, করুণাময়ী অমনি বলতেন, আহা, ওরা কত আশা করে আমার কাছে এসেছে।

কলকাতায় আসার দু'এক দিন আগে মা সিংহবাহিনীকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকে জাগ্রতা যে দেবীমূর্তিকে দেখে আসছেন, বিয়ের পর সুযোগ হলেই ভক্তিভরে যাঁর পূজা-অর্চনা করতেন—শত স্মৃতিবিজড়িত সেই দেবীমূর্তিকে এই তাঁর শেষ প্রণাম। তখন তিনি এত দুর্বল হয়েছেন যে, ঐটুকু গিয়ে ফিরে আসতেই খুব ক্লান্তি বোধ করেন। প্রণাম করে মনে মনে বলেন, মা, এইবার তোমার কোলে টেনে নাও। জ্বর হয়েছে শরীর দুর্বল, তবু সে কথা

প্রকাশ করতেন না। পাছে ভক্তদের দর্শনের ব্যাঘাত হয়। অথবা তাঁর জন্যে অন্যে চিন্তা করে। এমন নিঃশব্দ আত্মবিলোপের কথা কে কবে শুনেছে?

শ্রীমায়ের অসুখের সংবাদ শুনে ঠাকুরের সন্তানগণ, বিশেষ করে স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) খুব উদ্বিগ্ন হলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় আনালেন। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সারদাদেবী কলকাতা পৌঁছুলেন। তখন তার শরীর শীর্ণ; খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। শ্যামাদাস কবিরাজ তাঁর চিকিৎসা করতে থাকেন। তাঁর চিকিৎসায় একটু উপকার হয়; কিছুদিন জ্বর বন্ধ থাকে। শরীর তখন অনেকটা ভালোর দিকে। কিন্তু মুহূর্তের জন্য কারো মনে এই চিন্তার উদয় হয়নি, যে ক্রমাগত ভক্তসঙ্গ করার ফলে তাঁর আয়ুষ্কাল কমে এসেছে। কারো মনে হয়নি যে মর্ত্যের শরীরটা বুঝি আর তাঁকে বেশিদিন ধরে রখতে পারবে না।

কবিরাজী ঔষধের মধ্যে একটা তেতো পাচন ছিল। সকালে মা খেতেন। খুব তেতো বলে অনেকক্ষণ ঐজন্যে অস্বস্তি বোধ করতেন, এমন কি দুপুরবেলায় খাওয়ার সময় পর্যন্ত মুখের মধ্যে একটা বিস্বাদ ভাব থাকত। তাই ভাত খেতে পারতেন না। ওষুধ বদলানোর কথায় কবিরাজ বলেন যে, ঐ রোগের তেতো ছাড়া তাঁর ওষুধ নেই। যেন কবিরাজীর বদলে ডাক্তারী চিকিৎসা আরম্ভ হয়। দেড় মাস চললো এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসা। জ্বরও আবার দেখা দিল। কলকাতার নামকরা ডাক্তার যাঁরা ছিলেন—ডাক্তার প্রাণধন বসু, ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য ও ডাক্তার নীলরতন সরকার—তাঁরা সবাই মায়ের চিকিৎসা করেন। চিকিৎসকদের মধ্যে রোগনির্ণয়ের ব্যাপারে মতবৈষম্য দেখা দিল। নীলরতন বাবু বললেন কালাজ্বর। প্রাণধন বাবু খুব যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা করেছিলেন। দু'তিন দিন আসবার পর বললেন, আমাকেও আপনাদের মায়ের একজন সেবক মনে করবেন। মা তাঁকে খুব ভাল বাসতেন; তাঁর জন্য আম, লিচু

পাঠিয়ে দিতে বলতেন। রোগের উপশম হলো না। তখন আবার আরম্ভ হয় কবিরাজী চিকিৎসা। তখন শ্যামাদাস কবিরাজ অসুস্থ ছিলেন ; তাই কবিরাজ রাজেন সেন দেখতে এলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

রোগ দিনদিনই বাড়তে লাগল।

রোজ তিন-চারবার করে জ্বর উঠত। পিত্তপ্রধান জ্বর, সমস্ত শরীরে অসহ্য জ্বালা। মা বলতেন, পানাপুকুরের জলে গা ডুবিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। সেবকরা বরফে হাত রেখে তাঁরা সেই ঠাণ্ডা হাত মায়ের শরীরে বুলিয়ে দিতেন। যখন জ্বর বৃদ্ধি হতো, হুঁশ থাকত না। তখন গরমের দিন। একদিন দুপুরে অনেক দূর যাওয়ার পর তবে বরফ পাওয়া গেল। সেই সময় তাঁর অসহ্য গায়ের জ্বালা। বরফ কাপড় দিয়ে ঢেকে তার ওপর মায়ের হাত রাখতেই মায়ের খুব আরাম হলো। গায়ের জ্বালার জন্য, যাদের গা ঠাণ্ডা তারা কাছে গেলেই মা তাদের গায়ে হাত রাখতেন।

দীর্ঘকাল বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে শরীরে যেন রোগের যন্ত্রণা সহ্য হতো না। সেবকদের বলতেন, আমাকে একটু কোলে করে বসাতে পারো। আর শুয়ে থাকতে পারি না। তখন বালিশ উঁচু করে তাই ঠেসান দিয়ে মাকে বসিয়ে গায়ে ও মুখে কেউ হাত বুলিয়ে দিত। তিনি শান্ত হতেন। রোগশয্যায় মাঝে মাঝে তাঁর মন চলে যেত অতীতের দিকে। স্মৃতির পটে একে একে ভেসে উঠত কত ছবি। সেই ষোল বছর বয়সে স্বামীর ঘর করতে দক্ষিণেশ্বরে আসা, নহবতে বাস, ঠাকুরের অসুখ, দক্ষিণেশ্বরের পাট উঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় শ্যামপুকুরে চলে আসা, সেখান থেকে কাশীপুরের বাগান বাড়িতে ঠাকুরের শেষ যাত্রা। কী অসহ্য রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে দেহ রাখলেন যুগাবতার। ঝলকে ঝলকে গলা দিয়ে রক্ত উঠছে, তবু শিষ্য ও ভক্তদের উপদেশ দানে ক্লান্তি নেই।

তারপর একে একে তেত্রিশ বছর কেটে গেল। দক্ষিণেশ্বরের

ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল নাম। তাঁর সন্তানরা রামকৃষ্ণ নামের পতাকা কাঁধে নিয়ে সারা ভারতে প্রচার করলেন ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদার আদর্শ। সাগরপার থেকে এলো কত ভক্তনরনারী। দেখতে দেখতে আসমুদ্র হিমাচল রামকৃষ্ণের মহিমায় যেন টলমল করে উঠল। তাঁর দিগ্বিজয়ী সন্তানরা য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রচার করল সগৌরবে বেদান্তের উদারবাণী যা শুনে দলে দলে ইংরেজ ও মার্কিন নরনারী ভিড় জমায় গঙ্গার তীরে নতুন রামকৃষ্ণ তীর্থে। সেখানে বেলুড়মঠে বিবেকানন্দ স্থাপন করলেন মঠ —সেই মঠে সম্পূজিত হতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এসবই তাঁর চোখের সামনে ঘটে গেছে। আজ যেন মনে হয় সে সব যেন মাত্র সেদিনের ঘটনা।

এত যে অসুখে ভুগছেন তবু, সেবকরা দেখে অবাক হতেন, তাঁর মাতৃ হৃদয়ের অপরিসীম মমতা। যখন কেউ সকাল বেলায় কবিরাজের কাছে যাবার আগে রোগের বিবরণ নিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, শ্রীমা তাকে বলতেন, দুটি খেয়ে যাও, বেলা হবে। কবিরাজেরা দেখে যাবার পর তাঁদের জলযোগের ব্যবস্থা করার কথাটি পর্যন্ত ভুলতেন না। যখন যে ডাক্তার এসেছেন তাঁকে দেখতে, মা নিজে থেকে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। একদিন আরামবাগ থেকে তাঁর দু'জন প্রধান শিষ্য এসেছেন। খুব ক্ষীণস্বরে থেমে থেমে মা তাঁদের জিজ্ঞাসা করছেন, ভাল আছ বাবা? বাঁচব তো? কিছু খেতে পারি না, বড় দুর্বল। ঠাকুরও শেষের দিকে কিছু খেতে পারতেন না। রোগশয্যায় দেশেরও খবর নিতেন। যদি ঐ অঞ্চল থেকে কেউ দেখতে আসত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, এবার জল হয়েছে কি? যদি শুনতেন জল তেমন হয়নি, অমনি একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলতেন, না জানি এবার লোকের কত কষ্ট হবে।

কাশী থেকে যখন যে স্বামীজি এসেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, লাটু কেমন আছে? মা যখন অসুখে পড়েন তখন শুনেছিলেন লাটু

মহারাজের খুব অসুখ। ছাপরা জেলার এই মানুষটি ঠাকুরের প্রথম কৃপা লাভ করেছিলেন বলে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদার আসন ছিল। সামান্য গৃহভৃত্য ছিলেন তিনি, কিন্তু এক অসামান্য আধারের অধিকারী ছিলেন বলেই না শ্রীরামকৃষ্ণ এই সরল, নিরক্ষর মানুষটিকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকলেই স্বামী অদ্ভুতানন্দকে (লাটু মহারাজ) শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। ঠাকুর চলে যাওয়ার পর, লাটু মহারাজ শ্রীমাকে বলতেন, মা, তোমার পায়ে আমাকে একটু স্থান দিও। তিনিও খুব স্নেহ করতেন ঠাকুরের এই সন্তানটিকে। তিনি যখন রোগ শয্যায় তখনি লাটু মহারাজ দেহ রাখেন কাশীর আশ্রমে। এই দুঃসংবাদ সঙ্ঘ জননীকে শোনান হয়নি। কিন্তু তা জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্য কাশী থেকে কেউ এলেই তাকে বারবার লাটু মহারাজের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। এই যে অসীম মমতাভরা মাতৃহৃদয়—এর কোন তুলনা আছে?

তেমনি শ্রীমায়ের লোকান্তর গমনের দু'বছর আগে যখন স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) মৃত্যু হলো তখন সেই খবর পেয়ে তাঁর মাতৃহৃদয় সন্তানের শোকে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। সে দিন তাঁর চোখের জল থামেনি। বললেন, বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরাম রূপে গঙ্গাতীরে আলো করে বেড়াতো। খানিক বাদে, মাঝের ঘরের দক্ষিণের দেয়ালে ঠাকুরের যে বড় ছবি ছিল তার পায়ে মাথা রেখে করুণস্বরে বলেছিলেন, ঠাকুর, নিলে! সে কী মর্মভেদী স্বর। আপন সন্তানের শোকে কোন মা ঠিক এমন ভাবে কাঁদতে পারে কিনা সন্দেহ। তাঁর সঙ্ঘ-জননী নাম সার্থক ছিল।

দীর্ঘকাল রোগশয্যায় থাকতে হয়েছিল বলে অনেকেই মায়ের পরিচর্যা করতেন। যতক্ষণ কিছুমাত্র সামর্থ্য ছিল, শ্রীমা কাউকেই সেবা করতে দিতে এত সংকুচিত বোধ করতেন যে, তাঁর সেবা করার সুযোগই মিলত না। এই শেষ অসুখের সময় একদিন বেলা প্রায়

এগারোটার সময় মায়ের পথ্য হয়ে গিয়েছে, তক্তপোশের ওপর আড়ভাবে শুয়ে আছেন। একজন সেবক তাঁকে ঘুম পাড়াবার জন্য হাওয়া করছিলেন। চার-পাঁচ মিনিট পরেই বললেন, আর না, তোমার হাত ব্যথা করছে। সেবকটি যত বলেন, না মা, এ হাতপাখা, আমার একটুও হাত ব্যথা করছে না। করলে আমি আপনিই থামব।—মা তত বলেন, না, বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে। থাক্ আমি ঘুমুচ্ছি। একটু চুপ করেই আবার বলেন, বাবা, তোমরা হাত ব্যথা করবে ভেবে আমার ঘুম আসছে না। তুমি পাখা বন্ধ করো, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই। অগত্যা সেবকটিকে পাখা বন্ধ করতে হয়। রোগশয্যায় মাতৃহৃদয়ের এই যে স্নেহসিক্ত অনুভূতি, এটাই তো তাঁর চরিত্রে এনে দিয়েছিল একটা আশ্চর্য মহত্ত্ব।

ক্রমশ অসুখ বাড়তে লাগল।

ঘরের তক্তপোশ সরিয়ে দিয়ে মেঝেতেই বিছানা করা হলো। এ রোগ যে সারবে না, শ্রীমা তা জানতেন। সংসারে তাঁর একটি মাত্র বন্ধন ছিল। সে হলো ভাইঝি রাধু। এই রাধুর সম্পর্কেই ঠাকুর একবার মাকে বলেছিলেন, ও তোমার যোগমায়া। ঠাকুরের কথা মিথ্যা নয়। জীবের কল্যাণের জন্য রাধুর মায়া অবলম্বন করেই তো তিনি ঠাকুরের অদর্শনের পরও এই দীর্ঘকাল বর্তমান ছিলেন। সেই রাধুর সম্পর্কও তিনি এখন ছিন্ন করেছেন। একদিন এক ভক্ত বললে, মা, আপনি তো ইচ্ছা করলেই থাকতে পারেন।

—মরতে কার সাধ, বাবা? আমার নিজের ইচ্ছা বলে এখন আর কিছু নেই। ঠাকুর যখন নিয়ে যাবেন, যাব।

এই তো লীলাসঙ্গিনীর যোগ্য কথা।

একদিন তিনি ভক্তদের বললেন, আমি রাধুর ওপর থেকে মন ও মায়া তুলে নিয়েছি। ওকে এখন জয়রামবাটিতে ফিরে যেতে বল।

কথাটা রাধুর কানে গেল। সে ছেলেকে সঙ্গে করে এলো শ্রীমা'র কাছে। তিনি তখন চোখ বুজে শুয়েছিলেন। প্রবল জ্বরে বেহুঁশ হয়ে

পড়েছেন। তবু রাধু ও তার ছেলের স্পর্শ পেয়ে চোখ খুললেন। মায়াহীন সেই চোখের দৃষ্টি। ভাল করে একবার দেখে নিলেন রাধুর মুখখানি। তারপর বললেন, তুই জয়রামবাটিতে চলে যা। আর এখানে থাকিসনি।

—কেন যাব মা?

—তোদের ওপর থেকে মন তুলে নিয়েছি।

—আমি কি অপরাধ করেছি?

—আর নয়। আমি মায়া কাটিয়ে দিয়েছি। তুই বা তোর ছেলে আমার কেউ নয়।

রাধু কাঁদে নীরবে। তার পৃথিবী যেন শূন্য হয়ে গেল।

একজন সেবিকা তখন মাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি মন তুলে নিলে আমরা কি করে বাঁচব?

—আর নয়। মন যখন একবার উঠে এসেছে তখন আর সে নামবে না।

শিষ্য ও ভক্তেরা আপ্রাণ চেষ্টা করলো মাকে ধরে রাখতে, কিন্তু পারল না। তিনি শুধু রাধুর ওপর থেকে মন তুলে নেন নি। তার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বসংসার থেকে তাঁর মনকে গুটিয়ে নিয়ে কেন্দ্রীভূত করেছেন ব্রহ্মলোকে। এবার তিনি চলে যাবেন সেখানে। আসন্ন হয়ে আসে চিরবিদায়ের বেদনামাখা ক্ষণটি।

দিন যায়।

ক্রমে রক্তহীনতায় হাত-পা ফুলে উঠল।

বিছানা থেকে উঠবার শক্তি আর নেই। শুয়ে শুয়েই সব কিছু করতে হয় এখন। নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীরা পালা করে থেকে সব সময়ে শ্রীমায়ের সেবা করছিল। শরৎ মহারাজের নির্দেশে একজন ভাল ব্রাহ্মণকে দিয়ে যথাবিহিত শান্তি স্বস্ত্যয়ন করান হলো। কিন্তু কিছুতেই ফল হলো না। ছ'মাস আগেই চিকিৎসক বলেছিলেন, ভক্তদের মধ্যে যাঁরা দেখতে ইচ্ছা করেন তাঁদেরকে যেন খবর দেওয়া

হয়। লোকান্তর গমনের পাঁচ দিন আগের কথা। একজন স্ত্রী-ভক্ত দেখতে এসেছেন। ভেতরে যাওয়া নিষেধ বলে তিনি ঠাকুরঘরের দরজার কাছেই বসেছিলেন। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে তিনি মায়ের দৃষ্টিপথে পড়ে যান। করুণাময়ী ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। তিনি প্রণাম করে কেঁদে উঠলেন—মা, আমাদের কি হবে।

—ভয় কি? ঠাকুর আছেন। তিনিই তোমাদের দেখবেন।

শরীরত্যাগের দু-তিন দিন আগে শরৎ মহারাজকে ডেকে পাঠালেন মা। তিনি কাছে এলে বললেন, শরৎ, আমি চললাম। যোগেন, গোলাপ, এরা সব রইল, দেখো।

ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগেও অনুগতজনদের জন্য কী মমতাবোধ।

১৩২৭, ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

রাত দেড়টা।

ভক্তদের কাঁদিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী সারদাদেবী দিব্যধামে চলে গেলেন। পরের দিন বিকাল বেলায় বেলুড় মঠে গঙ্গার তীরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো। চিন্ময়ী জননী মাটির ঘট ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন। বাঙালী হিন্দু কুলবধূ সারদামণির ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, সকলের প্রতি সমান ভালবাসা, সেবাপরায়ণতা, দিনরাত অক্লান্ত ভাবে কর্মানুষ্ঠান ও নিজের শরীরের সুখদুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, তাঁর সরলতা, নিরভিমানিতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণ চিরকাল নারীসমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে কীর্তিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে মাতৃত্বে বরণ করেছিলেন, ভক্তেরা যাঁকে মা বলে ডাকতেন ও এখনো মা বলেই উল্লেখ করেন তাঁর এই পরিচয় শাশ্বত হয়ে থাকবে বাংলা তথা ভারতের নারীসমাজে। কালের পটে তাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তি কোনদিনই ম্লান হবে না। ম্লান হবে না সেই নিখিল-মাতৃ-হৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা-মূরতি?

শ্রীমায়ের বাণী

[১]

কারো দোষ দেখবে না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো, কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।

[২]

সব সময় সংসারে ভগবানের ওপর নির্ভর করে, বিশ্বাস করে পড়ে থাক।

[৩]

পৃথিবীতে জ্ঞানীর ভয় নেই অজ্ঞানীরই যত ভয়। তারাই বদ্ধ হয়, পাপে লিপ্ত হয়।

[৪]

গঙ্গার মহিমা মুখে বলে শেষ করা যায় না। দেবতা না হলে কি গঙ্গাতীরে বাস হয়? গঙ্গাস্নানে রোজের পাপ ক্ষয় হয়।

[৫]

ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ বিশেষ লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন। নরেন সপ্তঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি।

[৬]

বাসনা থেকেই ভোগ। চৌতলা বাড়িতে বাস করলেও যার বাসনা নেই তার কিছুই না। আর

গাছতলায় বাস করেও বাসনা থাকলে ঐ থেকেই সব ভোগ এসে পড়ে।

[৭]

স্বভাবই তো সব। মানুষ স্বভাব ছাড়তে পারে না। চৈতন্যদেব বলেছিলেন ঃ

'স্বভাব ছাড়িতে নারে জীবের দায়, দায়।
স্বভাব ছাড়িয়ে ভজে, ভক্তি তার পায়॥'

[৮]

লোক দেখানো ভক্তি জাহির করে কি লাভ! ভক্তি তো অন্তরের ঐশ্বর্য।

[৯]

সহ্যগুণ বড় গুণ। এর চেয়ে বড় গুণ আর নেই। ধৈর্য যদি চাও তবে ধরিত্রীর কাছ থেকে ধৈর্য কাকে বলে একবার শিখে নাও।

[১০]

পাপকে ঘৃণা করতে হয়, পাপীকে নয়।

[১১]

লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, মূর্তি পূজায় কিছু সত্য আছে কিনা? আমার সহজ বুদ্ধিতে আমি বুঝি যে সেই আদিকাল থেকে কত লোকে মূর্তি উপাসনা করে মুক্তি পেয়ে আসছে, এটা কি কিছু নয়? আমাদের ঠাকুরের এ রকম সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছিল না।

[১২]

সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক একজনে এক এক রকম বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য।

[১৩]

অনেকে বলে অকালে তীর্থদর্শনে পুণ্য হয় না। কথাটা ভুল। কালাকালের অপেক্ষা করে পুণ্য কাজ স্থগিত রাখা যায়, কিন্তু কালের কাছে, মানে যমের কাছে কালাকালের বিচার নেই। মরণের যখন অবধারিত কাল নেই, তখন সুযোগ উপস্থিত হলেই কালাকালের অপেক্ষা না করে পুণ্য কার্য করে ফেলা ভাল।

[১৪]

যত বড় মহাপুরুষই হোক, দেহ ধারণ করে এলে দেহের ভোগটি সবই নিতে হয়।

[১৫]

কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়; ঠাকুরকেও অসুখের সময় ভোগ করতে হয়েছিল। কোন জিনিস খেতে পারতেন না, এমন কি জলটুকু পর্যন্ত না।

[১৬]

সেই প্রকৃত মানুষ, যে সর্ব্বদা জগতের হিত করে।

[১৭]

ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম, এসব কত কি হয়। যেমন বটফলের বীচি—লাল শাকের বীচির চেয়েও ছোট এ থেকে অত প্রকাণ্ড গাছ। কি আশ্চর্য।

[১৮]

মানুষ এই আছে, এই নেই। কিছুই সঙ্গে যাবে না। একমাত্র ধর্মাধর্মই সঙ্গে যাবে। পাপপুণ্য মৃত্যুর পরও সঙ্গে যায়।

[১৯]

সংসারে মানুষকে রক্ষা করেন একজনই। তিনি

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হব। সাধ্য নেই, তৃণটিও নড়ে না।

[২০]

অনেকে এসে জিজ্ঞাসা করে আমাকে, ঈশ্বরে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট কেন? কেমন কা তাদেরকে বোঝাব যে, সৃষ্টিই সুখ দুঃখ ময়। দু না থাকলে সুখ কি বোঝা যায়? সকলের সু হওয়া একসঙ্গে সম্ভব নয়। চিরদিন কেউ সু থাকবে না, সব জন্ম কারো দুঃখে যাবে না। যে কর্ম তেমন ফল। আসল কথা, এই সৃষ্টি ঈশ্বরে অদ্ভুত খেলা'

[২১]

সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে যে মানুষ ঈশ্বরে মনে-প্রাণে ডাকতে পারে, সংসারে তার আর ভ ভাবনা থাকে না। ঈশ্বর নিজে তাকে হাত ধ নিয়ে যান।

[২২]

অবতারপুরুষকে সকলে ধরতে পারে না। দু একজনে চিনতে পারে মাত্র। তাঁরা জীব উদ্ধারে জন্য কত যন্ত্রণাই না সহ্য করেন। ঠাকুরের গ দিয়ে রক্ত বের হতো, তবুও কথার বিরাম কিসে জীবের মঙ্গল হয়।

[২৩]

পূজা, জপ, ধ্যান—এসবে ভগবান লাভ হয় না হয় শুধু তাঁর কৃপাতে। তবে ধ্যানজপ করতে হয় তাতে মনের ময়লা কাটে। যেমন চন্দন ঘসতে ঘসতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ধ্যানজপ পূজা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। সেটা হলে ভগবানের পথে অর্ধেক যাওয়া হয়ে গেল।